মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন ঃ

একটি বিশ্লেষন।

তাসনীম তাহের
রেজিঃ নং ঃ ১২৩
শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০০১-২০০২

GIFT

404163

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
404163

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ফেব্রুয়ারী, ২০০৭

404163

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন ঃ একটি বিশ্লেষন।

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি তাসনীম তাহেরের নিজস্ব রচনা ও এটি বা এর কোন অংশ কোথাও প্রকাশের জন্য জমা দেয়া হয়নি।

404163

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

এম, সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া

(অধ্যাপক সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন ঃ একটি বিশ্লেষন ।

গবেষনা অভিসন্দর্ভটি এম,ফিল
ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
সমাজ বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান
বিভাগে উপস্থাপন করা হলো ।

404163

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

এম, সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া

(অধ্যাপক সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।
ঢাকা ।

(তাসনীম তাহের)
এম,ফিল গবেষক
রেজিঃ নং ঃ ১২৩
শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০০১-২০০২
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।
ঢাকা ।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গবেষনার কর্মটি সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করার জন্য আমি প্রথমেই পরম করুনাময় আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। শত ব্যস্ততার মাঝেও গবেষনার শুরু থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে উপদেশ, উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করেছেন আমার তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক জনাব সাইফুল্লাহ ভূইয়া, তাঁর আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতীত গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করা আমার পক্ষে একেবারেই সম্ভব হতোনা, আমি তার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিভিন্ন সময়ে উপদেশ, পরামর্শ বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও সময় দিয়ে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক নজরুল ইসলাম আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাছাড়া এ গবেষনার কাজে আমাকে বিভিন্ন সময় উপদেশ ও পরামর্শ দ্বারা অনুপ্রানিত করেছেন বিভাগীয় শিক্ষবৃন্দ।

গবেষণা এলাকায় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি যাদের কাছে কৃতজ্ঞ তারা হলেন আবু সাইদ, শেখর দত্ত কেন্দ্রীয় কমিটি কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য জলি তালুকদার কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য কনক বড়ুয়া সাম্যবাদী দল, মোস্তফা আলমগীর রতন ওয়াকার্স পার্টির সদস্য, গবেষনার বিভিন্ন পর্যায়ে উৎসাহ দিয়ে অনুপ্রানিত করেছে আমার সহকর্মীবৃন্দ। বিশেষ করে মনিরা হক গবেষনার পুরাটা সময় আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, তার প্রতি আমি আন্তরিক কৃজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গবেষনা কর্মটি কম্পিউটার কম্পোজে সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য নুরে আলম তুহিন মিয়া ভাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়াও জিয়াউল কবির মানিক ভাই যিনি অত্যন্ত যত্নের সাথে ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমার গবেষণা

Dhaka University Institutional Repository

কর্মটি সম্পাদনে বিশেষ ভাবে সহযোগিতা করেছেন তার প্রতি আন্তরিক কৃজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গবেষণাকর্মে বিভিন্ন বই, প্রবন্ধ ও প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থগার, গণউন্নয়ন গ্রন্থগার, লালমাটিয়া মহিলা মহাবিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থগার ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সেমিনার গ্রন্থগারিক মাকসুদা বেগম ও বাশার ভাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

গবেষনার বিভিন্নস্তরে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে সঠিক ভাবে সহযোগিতা করেছেন আমার বাবা, মা। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

তাসনীম তাহের।
এম,ফিল গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা নির্বাস

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এদেশের স্বাধীনতা কষ্টার্জিত স্বাধীনতা। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের বিনিময়ে, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, বহু বড় বড় রাজনীতিবিদদের ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে। এই স্বাধীনতা মওলানা ভাসানী ছিলেন স্বাধীনতার প্রথম স্বপ্নদাতা। আমাদের দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে মওলানা ভাসানীর ভুমিকা অনস্বীকার্য । মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন, রাজনৈতিক দর্শন, আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সব সময়েই অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।

গবেষণা কর্মটি প্রথম অধ্যায়ে গবেষনার বিষয় বস্তু উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, অনুমান গঠন, গবেষণা পদ্ধতি, সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়,থেকে পঞ্চম অধ্যায় পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতিতে মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক কর্মকান্ড বর্ণনা করা হয়েছে। ষষ্ট ও সপ্তম অধ্যায়ে মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক দর্শন ধর্ম ও রাজনীতি, বর্তমান রাজনীতিবিদদের সাথে তাঁর তুলনা মুলক আলোচনা করা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে জরীপকৃত উপাত্ত বিশেষনের মাধ্যমে মওলানা ভাসানীর জীবনের বিভিন্ন দিক বা তার সম্পর্কে বিভিন্ন জনের মতামত উপস্থাপন করা হয়ে। সর্ব শেষ উপসংহারের মাধ্যমে গবেষণা কাজের সমাপ্তি টানা হয়েছে। সাবিৃক ভাবে গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষনে লক্ষ করা গেছে যে, মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক দর্শন আমাদের জন্য আদর্শ এবং এই দর্শনের উপর ভিত্তি করেই আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্রঃ-

কৃতজ্ঞতার স্বীকার -

গবেষণা নির্যাস -

অধ্যায় -১ ০১-১২

ভুমিকা ঃ - ০১-০২

১.১ গবেষণার উদ্দেশ্য- ০২-০৪

১.২ গবেষণার গুরুত্ব - ০৪

১.৩ অনুমান গঠন- ০৪-০৫

১.৪ সাহিত্য পর্যালোচনা - ০৫-১০

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি- ১০-১১

(ক) তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি- ১০

(খ) তথ্যের উৎস- ১০

১.৬ অধ্যায় বিন্যাস - ১১-১২

অধ্যায়-২

মওলানা ভাসানীর রাজনীতিতে হাতেখড়ি। ১৩-২৬

অধ্যায়-৩

মওলানা ভাসানীর আসামের রাজনীতি (১৯২৭-১৯৪৭)ইং ২৭-৩৩

অধ্যায়-৪

মওলানা ভাসানীর পাকিস্তান সময়ের রাজনীতি(১৯৪৭-১৯৭০)ইং ৩৪-৯০

অধ্যায়-৫

মওলানা ভাসানীর স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতি(১৯৭১-১৯৭৬)ইং ৯১-১০৭

অধ্যায়-৬

মওলানা ভাসানীর দর্শন। ১০৮-১২১

অধ্যায়-৭

মওলানা ভাসানী ও আজকের রাজনীতিবিদ। ১২২-১৩১

অধ্যায়-৮

তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষন। ১৩২-১৪১

অধ্যায়-৯

উপসংহার। ১৪২-১৬২

গ্রন্থপঞ্জি ১৬৩-১৬৭

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় - ১

বিষয়ঃ পৃষ্ঠা

১.১	ভুমিকা -	১-২
১.২	গবেষণার উদ্দেশ্য-	২-৪
১.৩	গবেষণার গুরুত্ব -	৪
১.৪	অনুমান গঠন-	৪-৫
১.৫	সাহিত্য পর্যালোচনা -	৫-১০
১.৬	গবেষণা পদ্ধতি-	১০-১১
	(ক) তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি-	১০
	(খ) তথ্যের উৎস-	১০
১.৭	অধ্যায় বিন্যাস -	১১-১২

Dhaka University Institutional Repository

"যে জাতি তাঁর অতীত বীরদের ভুলে গিয়ে শুধু বর্তমান নায়কদের সম্মান জানায় সে জাতি অনুপ্রেরনার দিক থেকে দারিদ্র্যগ্রস্থ"[১] একটি বিখ্যাত উক্তি, যুগে যুগে এক এক সময়ে এক এক স্থানে বহু মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন। সেই সকল মহা পুরুষদের দিক নির্দেশনায় কখনও চালিত হয়েছে একেকটি রাষ্ট্র বা জাতি। আবার কখনও এদেরই পথ ধরে খুঁজে পেয়েছে নিজের অস্তিত্ব। বাঙালী জাতির ইতিহাস সু-প্রাচিন, জাতি গঠনের প্রচেষ্টা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে শুরু হয়েছে। কতশত মনীষী বাঙালী জাতি গঠনের সংগ্রামে অবদান রেখেছে তা একবারে বলা সম্ভব নয়। তাদের জীবন কাহিনীই বাঙালীর ইতিহাস, হাজার বছর ধরে বাঙালীর শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। আর এই হাজার বছরের সংগ্রাম আমাদের জন্য, আমাদের অস্তিত্বের জন্যে, আমাদের স্বাধীনতার জন্যে আমাদের মধ্যে যুগে যুগে সৃষ্টি হয়েছে অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। এদেঁর মধ্যে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী অন্যতম।

মওলানা ভাসানী ছিলেন স্বদেশের ও সারা বিশ্বের শোষিত নির্যাতিত কৃষক শ্রমিক ও সকল মেহনতি ও দেশপ্রেমিক জনগণের এক মহান নেতা। বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিশেষ করে কৃষক জনগনকে সংগ্রামে নেতৃত্বদানের মধ্যে দিয়ে তিনি কিংবদন্তীর নায়কতুল্য এক মহান জননেতার মর্যাদা লাভকরেন। পাকিস্তান আমলে সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ধনিক শ্রেনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং বিশেষ করে পূর্ব বাংলার জনগনের স্বাধিকার ও পরে স্বাধীনতার সংগ্রামে তিনি ছিলেন আপোসহীন শীর্ষ নেতা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরেও সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদের দালাল লুটেরা পুঁজিবাদ ও সমান্ততান্ত্রিক শোষণ নির্যাতনে বিরুদ্ধে বিশেষ করে স্বাধীনতার সুফল কুক্ষিগতকারী গণবিরোধী শাসক শ্রেণীর শোষণ লুন্ঠন বিদেশে সম্পদ ও অর্থ পাচার এবং জননির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামে তিনিই ছিলেন কৃষক শ্রমিক ও সকল মেহনতি মানুষের সংগ্রামে

(১) মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী (প্রথম খন্ড) স্মারক সংকলন পৃষ্ঠা ১৭৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান ভরসাস্থল। জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে ভারতের অধিপত্যবাদী নীতি ও আচরণের বিরুদ্ধে 'ফারাক্কা লংমার্চএ' নেতৃত্ব দিয়ে তিনি আমাদের জনগনের সংগ্রামের ইতিহাসে এক অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক জনদরদী ও সমাজতন্ত্রের দৃঢ় সমর্থক। এম ফিল গবেষণা কাজে মওলানা ভাসানীর 'রাজনৈতিক জীবন' বেছে নিয়েছি। বিভিন্ন কারনে আমি তাঁর উপর লিখতে উৎসাহিত হয়েছি।

প্রথমতঃ তিনি ছিলেন মজলুম জননেতা। তিনি একদিকে বাংলার সাধারণ কৃষক শ্রমিকের স্বার্থ আদায়ে জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, বৃটিশ পরাধীনতার বিরুদ্ধে পাকিস্তান অর্জনের সংগ্রাম করেছেন তেমনি ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভাগের পর পাকিস্তানী শোষনের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বার্থ আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ তিনি সারা জীবন বিরোধী রাজনীতি করেছেন। দেখা যায় যে, তার দল কখনও সরকার গঠন করলেও তিনি সেই সরকারে অংশ গ্রহন করেননি। প্রয়োজনে কঠোর সমালোচনা করতেও দ্বিধাবোধ করেননি।

তৃতীয়তঃ তিনি ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা করে দেখেননি। তিনি ছিলেন একধারে অগনিত গ্রামের সাধারণ কৃষক শ্রমিকের পীর হুজুর, তাঁর ছিল হাজার হাজার ভক্ত ও আশেকান। অন্যদিকে জাতির সাধারণ মানুষের ভাগ্যনিয়ন্ত্রা যিনি তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন সৃষ্টি করেছেন অনেক জনপ্রিয় জননেতার।

১.১ গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ

বাংলাদেশ গড়ার বিভিন্ন আন্দোলনের মহা নায়ক মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বাংলাদেশের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর রাজনীতি ও আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। তিনি কৃষক সমাজেও রাজনীতিকে পৌছে দিতে

Dhaka University Institutional Repository

পেরেছিলেন। আবার ছাত্র ও যুব সমাজের মাঝেও তাকে বিচরণ করতে দেখা গেছে।

জাতীয় আন্তর্জাতিক পরিবেশ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষন, আলোচনা পর্যালোচনা করলে এটাই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আজ আমাদের দেশের কৃষক শ্রমিক শোষিত মজলুম জনগণ নিদারুন দুঃখ কষ্ট দুর্দশা ও হতাশার আকুল সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে কেবলমাত্র মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর মত ব্যক্তি গোষ্ঠী দল স্বার্থমুক্ত, নির্লোভ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আপোষহীন জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের অভাবজনিত চরম শূণ্যতা বিরাজ করছে বলেই। দেশে আজ মওলানা ভাসানীর মত কৃষক শ্রমিক মজলুম জনগণের দুঃখ দূর্দশার কথা, তাদের দাবী দাওয়ার কথা সোচ্চার কন্ঠে বলার মত সাহসী নেতার খুবই অভাব। বিভিন্ন রাজনৈতিক আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের মধ্যে শোষণ জুলুম আধিপত্য সম্প্রসারণ, আগ্রাসন বিরোধী দেশ প্রেমিক জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল হাজার হাজার কর্মী সঠিক দিক নির্দেশনার ও আপোষহীন সংগ্রামী নেতৃত্বের অভাবে আজ দিকভ্রান্ত , দেশের সাধারণ মানুষ কৃষক শ্রমিক মজলুম জনগন দেশের প্রগতিশীল সংগ্রামী দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক কর্মীগণ আজ মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর মত শোষণ জুলুম আগ্রাসন আধিপত্যবিরোধী জনগনের অতন্দ্রপ্রহরী বলিষ্ঠ আপোষহীন নেতৃত্বই খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ব্যাপক অর্থে এই গবেষনার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন বিশ্লেষন এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ এই গবেষণায় তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো-

১। একজন সত্যিকারের নেতার গুনাবলীর শর্তাবলী বিশ্লেষন।

২। মওলানা ভাসানীর ন্যায় বঞ্চিত শোষিত জনগনের জন্য যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুধানব।

৩। সকল কিছুর উর্ধে দেশের স্বার্থকে বড় করে দেখার মানসিকতায় গড়ে উঠা নেতৃত্বের উদাহরন- মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বের স্বরূপ উন্মোচন করা।

৪। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্ব ও বর্তমান সময়ের নেতৃত্বের বিশ্লেষন।

৫। ধর্ম ও রাজনীতি সম্পর্কে মওলানা ভাস।নীর দর্শন।

Dhaka University Institutional Repository

মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর জীবন ও সংগ্রাম আমাদের জনগনের সংগ্রামের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য ও অতি গুরুত্বপূর্ন অংশ, সেজন্য তাঁর জীবন ও সংগ্রাম পর্যালোচনা বা মূল্যায়ন মানেই হচ্ছে আমাদের জনগনের সামান্ত বাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন। জনগনের সংগ্রামে নেতৃত্বদান কারী শক্তির সার্থক ভবিষ্যত যাত্রার প্রয়োজনে সে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন থেকে শিক্ষা নেয়া কর্তব্য। আমার মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন নিয়ে গবেষনার উদ্দেশ্য ও তাই।

১.২ গবেষনার গুরুত্ব ঃ

আমাদের দেশের বর্তমান রাজনীতির চালচিত্র, বলিষ্ট নেতৃত্বহীনতা, জনগনের দিকভ্রান্ততা, দূর্নীতি, মিথ্যাচার, বক্তৃতাসবর্স্ব অসৎ ব্যক্তিত্বহীন রাজনীতিবিদদের কারনে অসহায় জনসমাজের মুক্তির আলোর নির্দেশনা বড়ই প্রয়োজন। এই সত্যটা অনুধাবন করেই কিংবা গুরুত্ব বিবেচনা করেই আমি এমন একজন রাজনীতিবিদকে আমার গবেষণার বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছি যিনি আমাদের রাজনীতিবিদদের ইতিহাসের একমাত্র অতুলনীয় নেতা। যার জীবন সংগ্রাম রাজনীতি, দেশপ্রেম, গরিব দুঃখীর প্রতি ভালবাসা আমাদের প্রয়োজন কিন্তু যেহেতু তিনি জীবিত নেই তাই তাঁর রাজনৈতিক জীবন গবেষনার মাধ্যমে আমরা হয়তো একটু আলোর নিশানা পেতে পারি সেই কিছুটা আলোর নিশানার প্রত্যাশাকে সামনে রেখে এগিয়ে যাওয়াই আমার গবেষনার উদ্দেশ্য যাতে করে এটি আমাদের কাজে আসে।

১.৩ অনুমান গঠন-

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে মওলানা ভাসানীর অবদান অনস্বীকার্য। মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন বিশ্লেষন করলে অনুধাবন করা যায় কেন মওলানা ভাসানী আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে । এই ক্ষেত্রে এই গবেষণা কার্য পরিচালনার জন্য নিম্নরূপ অনুমান সমূহ গঠন করা হল-

(ক) মওলানা ভাসানী ছিলেন মজলুম নেতা।

(খ) মওলানা ভাসানী ছিলেন ধর্ম নিরপেক্ষ নেতা ।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) মওলানা ভাসানী সারা জীবন বিরোধী দলে অবস্থান করেন।

(ঘ) মওলানা ভাসানীর মধ্যে নেতৃত্বের সকল গুণাবলী গুলি বিদ্যমান ছিল।

(ঙ) মওলানা ভাসানীর রাজনীতি ছিল আদর্শ রাজনীতি।

১.৪ সাহিত্য পর্যালোচনা ঃ

মওলানা ভাসানীর জীবন সংক্রান্ত গবেষনা বাংলাদেশে একদম নেই বলা যায় না। তবে এমন একজন বড়মাপের সত্যিকারের রাজনৈতিক নেতার রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে ব্যাপক গবেষনার কোন পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়নি । বিশেষ করে তাঁর নেতৃত্বের স্বরুপ, ধর্মের সাথে রাজনীতির সম্পৃক্ততা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ অপেক্ষা দেশের স্বার্থ বড় এরুপ মানসিকতার চিত্র প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তেমন গবেষনা দেখা যায় না। মওলানা ভাসানী সম্পর্কিত বিষয় যেমন-জন্ম, মৃত্যু, রাজনীতি, জীবন সম্পর্কিত কিছু প্রকাশিত বই, প্রবন্ধ, স্মৃতিচারনমূলক সংকলন পাওয়া গেছে। কাজেই বর্তমান গবেষনা কার্যের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত কয়েকটি বই সংক্ষিপ্ত ভাবে উপস্থাপন করা হলো।

"শতাব্দীর জননেতা মওলানা ভাসানী" খন্দকার আব্দুর রহিম এর লেখা একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। গ্রন্থটি ৪টি খন্ডে বিভক্ত। ১ম খন্ডে রয়েছে মওলানা ভাসানীর জন্ম শৈশব, কিশোর, বিবাহ ও রাজনীতিতে আগমনের প্রেক্ষাপটের আলোচনা। ২য় খন্ডে রয়েছে বৃটিশ সময়ে মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক কর্মকান্ড। ৩য় খন্ড রয়েছে পাকিস্তান সময়ে মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক কর্মকান্ড সম্পর্কিত তথ্য। ৪র্থ খন্ডে রয়েছে বাংলাদেশ সময়ে মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও মৃত্যু সম্পর্কিত আলোচনা কিন্তু বর্তমান সময়ের নেতাদের সাথে তাঁর কোন তুলনা কিংবা ধর্ম ও রাজনীতির সম্পৃক্ততা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি।

"রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তায় উপমহাদেশ" সৈয়দ মাকসুদ আলীর লেখা একটি চমৎকার গ্রন্থ, এই গ্রন্থের ২৩ তম অধ্যায়ে "গণমূখী সংগ্রামী রাজনীতি" মওলানা আবদুল হামিদ খাঁন ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয় কিন্তু কোথাও

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর সাথে বর্তমান নেতার তুলনা, ধর্মের সাথে রাজনীতির সুত্রতা নিয়ে আলোচনা করা হয়নি।

"মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন সংগ্রাম" সম্পাদনাঃ শাহরিয়ার কবির এর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের মূল বিষয় ছিল - মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রামের পূনাঙ্গ চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস। কিন্তু কোথাও বর্তমান নেতাদের সাথে তুলনা কিংবা ধর্ম ও রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর দর্শন তুলে ধরা হয়নি।

"কিছুকথা" অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ এর একটি চমৎকার গ্রন্থ। এই গ্রন্থে শোষিত জনগন ও জাতীয় নেতৃবৃন্দ অধ্যায়ে মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবনের রূপ উন্মোচন করার চেষ্টা করা হয় কিন্তু বর্তমান নেতার সাথে তাঁর তুলনা কিংবা ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক কেমন হওয়া প্রয়োজন সে সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা হয়নি।

"মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী" (প্রথম খন্ড) সম্পদনা শাহজাহান মন্টু রবিউল করিম দুলাল মওলানা ভাসানীর উপর একটি সংকলন সম্বলিত গ্রন্থ। এর প্রতিটি অধ্যায়ে মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা আদর্শ তুলে ধরার চেষ্টা করা হলেও কোথাও বর্তমান নেতাদের সাথে তাঁর তুলনা মূলক আলোচনা নেই। ধর্ম ও রাজনীতি সম্পৃক্তত। আলোচনা করা হয়নি।

"মওলানা ভাসানী" (দ্বিতীয় খন্ড) গ্রন্থনা সম্পদনা শাহজাহান মন্টু রবিউল করিম দুলাল। মওলানা ভাসানীর রাজনীতি ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয় এই গ্রন্থে। তাঁর জীবন কাহিনী নিয়ে প্রকাশিত অপ্রকাশিত লেখাসমূহ জনগনের কাছে পৌছে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। তবে আজকের দিনে মওলানা ভাসানীর রাজনীতির মূল্যায়ন করা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

"সংগ্রামী জননেতা মওলানা ভাসানী" সম্পাদনা মোশারফ উদ্দীন ভূঞা, আবুল ওমরাহ মুহাম্মদ ফখরউদ্দীন-একটি সংকলন গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বিভিন্ন লেখকবৃন্দ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মওলানা ভাসানীর সংগ্রামী জীবনকে উপস্থাপন করেছেন। কোথাও বর্তমান সময়ের রাজনীতিবিদ কিংবা ধর্মের সাথে রাজনীতির সম্পর্ক অতীত ও বর্তমান দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়নি।

"আসাম ও মওলানা ভাসানী এবং লাইন প্রথা-বাঙ্গালখেদা", নজরুল ইসলামের একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। এই বইটিতে তিনি মওলানা ভাসানীর আসামের রাজনীতির উল্লেখযোগ্য দিক গুলো তুলে ধরেছেন। অনেক না জানা কথা এই গ্রন্থটির বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে জানা যায়। এটি মুলত মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবনের উল্লেখযোগ্য একটি সময়ের আলোচনা । এতে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অন্যান্য দিকগুলো আলোচনা করা হয়নি।

"আবদুল হামিদ খাঁন ভাসানী" মোঃ ইনামুল হক এর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী মূলক গ্রন্থ। এতে মওলানা ভাসানী একজন রাজনৈতিক নেতা হিসাবে রাজনীতিকে কিভাবে প্রভাবিত করেছেন তার চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি ছিলেন মজলুম জননেতা, বিপ্লবী জননেতা, সংগ্রামী জননেতা ইত্যাদি অর্থাৎ তাঁর নেতৃত্বের বিভিন্নরুপ ফুটে উঠেছে এই গ্রন্থটিতে। তবে তিনি ধর্মীয় নেতা না জননেতা তা পরিষ্কার ভাবে আলোচনা করা হয়নি ।

"মজলুম জননেতা, মওলানা ভাসানী" সম্পাদনা মহসিন শস্ত্রপানি-একটি সংকলন গ্রন্থ। এত বিভিন্ন লেখকের স্মৃতিচারন, বিবরণ ও মুল্যায়নমূলক রচনাবলীর মাধ্যমে মওলানা ভাসানী দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের মোটামোটি একটি রেখাচিত্র অংকন করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে বর্তমান সময়ের রাজনীতিবিদ থেকে তাঁর পার্থক্য নির্ণয় করা হয়নি কোথাও।

Dhaka University Institutional Repository

"কিশোর মওলানা ভাসানী" আবদুল হাই শিকদার মহান নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর বিশাল ব্যাপক জীবনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, জাতীয় ইতিহাসের এক মহান স্থপতির সংক্ষিপ্ত কিন্তু আদ্যোপান্ত জীবন খুঁজে পাওয়া যায় এই দুই মলাটের মাঝখানে।

"জানা অজানা মওলানা ভাসানী" আবদুল হাই শিকদারের গবেষনাধর্মী গ্রন্থ। এতে আসলে এক ধরনের খনন, আত্মানুসন্ধান, মওলানা ভাসানীর সন্ধান, শিকড়ের দিকে যাওয়া এই গ্রন্থে মওলানা ভাসানীর জীবনের উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন দিকগুলো ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তবে ধর্ম ও রাজনীতির সম্পৃক্ততা বিষয়ে তেমন আলোচনা করা হয়নি।

"আমার দৃষ্টিতে মওলানা ভাসানী" আবদুল মতিনের লেখা বইটি একটি চমৎকার বই। এই বইতে মওলানা ভাসানীর বেশ কিছু দিক উন্মোচিত হয়েছে যেগুলো অন্যান্য বইতে তেমন দেখা যায় না। তাঁর জীবনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ধর্ম ও অন্যান্য রাজনীতিবিদদের সাথে তাঁর পার্থক্য দেখানো না হলেও কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে।

"ভাসানী" মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জীবন কর্মকান্ড রাজনীতি ও দর্শন (প্রথম খন্ড) একটি পূণাঙ্গ বই। এতে মওলানা ভাসানীর জীবনের প্রথমদিক থেকে শুরু করে স্বাধীনতা উত্তরকাল সময় পর্যন্ত অত্যন্ত সাবলীল বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যা অত্যন্ত সুখ পাঠ্য তবে বইটিতে ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়টি ততটা আলোকপাত করা হয়নি। বর্তমান রাজনীতিবিদদের চরিত্রের সাথে তাঁর পার্থ্যক্যটা ততটা উপস্থাপন করা হয়নি।

'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫' - অলি আহাদ এর বইটি একটি গুরুত্বপূর্ন বই । এতে বাংলাদেশের রাজনীতির পূর্ব ও পরবর্তী বিষয়গুলো পরিষ্কার ভাবে আলোচনা করা হয়। অনেক অজানা কথা জানা যায় বইটি পাঠ করলে। এতে

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা ভাসানীর বিভিন্ন সময়ে রাজনীতিতে অবদান অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে উপস্থাপন করা হয়।

"স্বাধীনতা ভাসানী ভারত"-সাইফুল ইসলাম রচিত গ্রন্থে মওলানা ভাসানীর অসামান্যতা নানাভাবে প্রকাশ পায়। মওলানা যে অসাধারণ ছিলেন তাঁর রহস্য ছিল তাঁর রাজনীতি । এই বইটিতে সাইফুল ইসলাম একাধারে ভাসানীকে এবং এদেশের গনতান্ত্রিক আন্দোলনকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

"ভাসানী যখন ইউরোপে' খন্দকার ইলিয়াসের লেখা গ্রন্থটি মওলানা ভাসানীর প্রবাস জীবনের কাহিনী অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করে বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা রোধ করার প্রয়াসে আইয়ুব সরকার ৫৮ সালে ডিসেম্বর মাসে ৬৫ সালের মে মাসে দুইবার বইটি বাযেজাপ্ত করে। এই গ্রন্থটি অত্যন্ত সুন্দর ভাবে বর্ননা করা হয়েছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। মওলানা ভাসানীর ব্যক্তিত্বকে এই সময় বিশ্বের মানুষ জানতে পারে তাঁর ন্যায় আদর্শ নীতি ও ধর্ম সম্পর্কে চিন্তাধারাকে যাচ্ছিল পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এই গ্রন্থটিতে প্রকৃতপক্ষে তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের বর্ণনা দেয়া আছে অন্যান্য বিষয় তেমন আলোকপাত করা হয়নি।

"মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন"ঃ একটি বিশ্লেষন -

মওলানা ভাসানী সম্পর্কে আমার এই গবেষণা কর্মটি 'মওলানা ভাসানী সম্পর্কিত কাজের মধ্যে কিছুটা ব্যাতিক্রমী কাজ হিসাবে গন্য করা যায়। 'মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন' বিশ্লেষন ব্যতীত মওলানা ভাসানীর রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব কতটুকু এবং বর্তমান রাজনীতিবিদদের থেকে তাঁর পার্থক্য কতটুকু তাঁর চিত্র অংকন করা যেত না।

অতএব, আমার এই গবেষণাটি আশা করি ভবিষ্যতে যারা মওলানা ভাসানীর জীবন নিয়ে কাজ করবেন তাদের কিছুটা হলেও দিক নির্দেশনা দিতে পারবে। তাছাড়াও

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিবিদ বা রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এই কাজটি সহায়ক হবে বলে আমি আশা করছি।

গবেষণার পদ্ধতি ঃ-

গবেষনা কর্মের জন্য গবেষনা পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন করে। মূলতঃ গবেষণা বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গবেষনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। আমি আমার গবেষনা পদ্ধতির বিবরণ নিম্নে প্রদান করলাম।

তথ্যের উৎসঃ-

গবেষণার জন্য তথ্য একটি অপরিহার্য বিষয়, মূলতঃ তথ্যের উপর ভিত্তি করেই গবেষণা কর্ম এগিয়ে যায়। বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এই গবেষণা কর্মটি করা হয়।

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ঃ-

এই গবেষণার মূলতঃ দু'টি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

১। প্রাথমিক উৎস।

২। মাধ্যমিক উৎস।

প্রাথমিক উৎসঃ-

প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য লিখিত প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রশ্নমালায় উন্মুক্ত ও আবদ্ধ দুই ধরনের প্রশ্নই রাখা হয়েছে। প্রশ্নগুলো এমন ভাবে করা হয়েছে যাতে করে উত্তরদাতার কাছ থেকে সুস্পষ্ট ও সরাসরি উত্তর পাওয়া যায়। তাছাড়াও প্রশ্নে উত্তরদাতার মতামত কিংবা পরামর্শ আমার গবেষণার জন্য কাজে আসে। তাছাড়াও এতে করে উত্তরদাতার উত্তর প্রদানের ইচ্ছা ও আগ্রহ দেখা যায়। এবং সুস্পষ্ট ও তথ্যবহুল উত্তর পাওয়া যায়। সু-নির্দিষ্ট প্রশ্ন ছাড়াও আমার গবেষণায় পর্যবেক্ষন পদ্ধতি অবলম্বন করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমিক উৎসঃ-

প্রাথমিক উৎসের পাশাপাশি মাধ্যমিক উৎস যেমন- দেশী বিদেশী পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন সংকলন বিভিন্ন সম্পাদনা, বই পুস্তক ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

অধ্যায় বিন্যাসঃ-

গবেষণা কর্মটিকে মোট নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে আলাদা আলাদা বিষয় আলোচনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় ঃ-

এ অধ্যায়টিতে গবেষনার ভুমিকা দেয়া হয়েছে। এতে গবেষণার বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, পুস্তক পর্যালোচনা, গবেষণা পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় সংযুক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ-

এ অধ্যায়ে মওলানা ভাসানীর জন্ম, শিক্ষা, পরিবার ও রাজনীতিতে প্রবেশের পটভুমি আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ-

এ অধ্যায়ে মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম অংশের অর্থাৎ (১৯২৭-১৯৪৭) ইং পর্যন্ত সময়কালের আলোচনা করা হয়।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ-

এ অধ্যায়ে মওলানা ভাসানীর পাকিস্তান সময়েরে রাজনীতির (১৯৪৭-১৯৭০)ইং আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় ঃ-

এ অধ্যায়ে মওলানা ভাসানীর স্বাধীন বাংলাদেশ সময় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত (১৯৭১-১৯৭৬) ইং রাজনীতির আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ-

এ অধ্যায়টিতে মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবনের দর্শন ও দর্শনের মূল্যায়ন করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় ঃ-

বর্তমান সময়ের রাজনীতিতে তিনি কতটা ভুমিকা রাখছেন কিংবা তার মতাদর্শ বর্তমান রাজনীতি বিদগণ গ্রহন করছে কিনা তা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে অর্থাৎ বর্তমান রাজনীতিবিদদের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়। এছাড়াও এই অধ্যায়ে মওলানা ভসানীর রাজনৈতিক জীবনের সাথে ধর্মীয় জীবনের মিল অমিল অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। ধর্ম তাঁর রাজনীতিতে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল তা অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়।

অষ্টম অধ্যায় ঃ-

এই অধ্যায় গবেষণার ফলে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক, তথ্য সংগ্রহ, উপস্থাপন ও বিশ্লেষন করা হয়েছে।

নবম অধ্যায় ঃ-

মওলানা ভসানীর রাজনৈতিক জীবনের সকল দিক উম্মোচন করে মূল্যায়ন করা হয় এই অধ্যায়ে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় - ২

মওলানা ভাসানীর রাজনীতিতে হাতে খড়ি।

Dhaka University Institutional Repository

একজন মানুষ, একজন রাজনীতিবিদ, একটি ইতিহাস, একটি শতাব্দীর সাক্ষী মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী, যে মানুষটির পরনে সব সময় থাকত সাদা পাঞ্জাবী, অতি সাধারন লুঙ্গী, মাথায় তালের টুপি, মুখে সাদা দাড়ি সম্বলিত উদাত্ত কণ্ঠস্বরের এই মানুষটি এভাবেই পরিচিত ছিলেন আমাদের কাছে।

কোন কোন মানুষ মরেও অমর হয়ে থাকে। মওলানা ভাসানী তেমনি একজন মানুষ। অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল কৃষক শ্রমিক মেহনতী মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তিনি ছিলেন আপোষহীন নেতা। সারা জীবন লড়াই করেছেন অন্যায় জুলুম ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। তাই তিনি সকলের হৃদয়ে অমর হয় আছেন।

গোটা উপমহাদেশের রাজনৈতিক মঞ্চে মওলানা ভাসানীই বোধ হয় ছিলেন গ্রাম থেকে উঠে আসা একমাত্র জননায়ক। গ্রামের নিসর্গ নয় দৈন্যপীড়িত মানুষগুলো ছিল তাঁর গ্রামপ্রীতির মূলে। কামার, কুমার, কৃষক, তাঁতী জেলে আর ঘরামিদের যন্ত্রনা ও স্বপ্নের কথা এমন বিশদভাবে আর কেউ তুলে আনেনি আমাদের তথা উপমহাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে। শহরের মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি বার বার বলতেন ষাট-বাষট্টি হাজার নিস্তরঙ্গ গ্রামের কথা, গ্রামীন মানুষের দুর্গতির কথা এখানেই মওলানা ভাসানীর স্বাতন্ত্র্য ও শক্তির চাবিকাঠি।

প্রচলিত ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষা লাভ না করে মক্তব মাদ্রাসাতে লেখাপড়া করেও উপমহাদেশের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের নেতৃত্বে আরোহন তাঁর জন্য কোন প্রতিবন্ধকতা হয়নি, তিনি ছিলেন এমনি প্রখর জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা এবং ধীশক্তিসম্পন্ন এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

মক্তব মাদ্রসার ইসলামী বিদ্যাসত্ত্বেও তিনি ছিলেন আধুনিক, প্রগতিশীল, সংস্কারমুক্ত ও অসাম্প্রদায়িক। তাঁর বুদ্ধিমত্তা জ্ঞান গরিমা, ব্যবহার সৌজন্যতা, যুক্তিবাদ বিবেচনা ও দুরদর্শিতা, অসাধারন বাগ্মীতা ও আলোচনা পারদর্শিতা তাঁকে

Dhaka University Institutional Repository

উপমহাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বে দৃঢ় ও স্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। উপমহাদেশে তিনিই বোধহয় একমাত্র নেতা যিনি দীর্ঘ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বুর্জোয়া এবং কৃষকদের সামন্তবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সম্পর্কিত ও নেতৃত্ব প্রদানকারী অবস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি বাধর্ক্যকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জরা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। এমন সুস্থ শারীরিক মানসিক জীবনী শক্তি সম্পন্ন রাজনৈতিক নেতা সচারাচর দেখা যায়না।

তাঁর সুদীর্ঘ ও সংগ্রামশীল রাজনৈতিক জীবনে মওলানা একদিকে যেমন বৃটিশ পরাধীনতার বিরুদ্ধে উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবিস্মরনীয় অবদান রেখেছেন তেমনি ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভাগের পর সাবেক পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক শোষকদের বঞ্চনার নীতি অগনতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী কর্মকান্ড এবং সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের তথা এ দেশের জনগনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, শোষন- বঞ্চনা এবং নিপীড়নের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি প্রতিবাদী ও সংগ্রামী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে অবিস্মরনীয় অবদান রেখেছেন।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে, যুক্তফ্রন্ট গঠন ও চুয়ান্ন সালের সাধারন নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয় অর্জনে ১৯৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনের দাবী উচ্চারণে, উনসত্তরের গন অভ্যুত্থানে এদেশের স্বাধীকার আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদ্ধয়ের পেছনে জননেতা মওলানা ভাসানীর প্রেরনা ছিল অবিস্মরনীয়।

মওলানা ভাসানীর সুদীর্ঘ ও সংগ্রামশীল রাজনৈতিক জীবনে তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের এবং সমাজ সংস্কারকের ভূমিকার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যছিল সাধারন জনগনের কৃষক, শ্রমিক মজুরের কল্যান সাধন, শোষন বঞ্চনার এবং অত্যাচার নিপীড়নের অবসান ঘটানো, দারিদ্র বিমোচন এবং প্রগতিশীল, উন্নত ও

Dhaka University Institutional Repository

সমৃদ্ধ দেশ গঠন। ক্ষমতার জন্য তিনি কখনো রাজনীতি বা আন্দোলন করেননি জনগনের অধিকার আদায়ই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য।

স্বাধীনচেতা গনতন্ত্র এবং জনগনের কল্যাণকামী মওলানা ভাসানী পরাধীনতা, সাম্রজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী শাসন-শোষন এবং জনগনের বঞ্চনার বিরুদ্ধে ছিলেন আজীবন সোচ্চার ও সংগ্রামী, তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে প্রায় শতবর্ষ আয়ুস্কালের মধ্যে এই মহান জননায়ক বৃটিশ ভারতে 'ইংরেজ খেদা' আন্দোলন, অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন, আসামে বাংগাল খেদা' ও লাইন প্রথা বিরোধী আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ইত্যাদি হতে শুরু করে পাকিস্তানোওর কালের সকল গণ আন্দোলনে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তীকালের বিভিন্ন গণআন্দোলনেও জনকল্যাণ আর দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষাই ছিল মওলানা ভাসানীর মূল চালিকাশক্তি। বস্তুতঃ বৃটিশ আমলে কংগ্রেস এবং মুসলীমলীগ নেতা কৃষক আন্দোলনের নেতা এবং বিভাগ পরবর্তীকালে আওয়ামী মুসলিমলীগ ও ন্যাপ নেতা হিসাবে তিনি এসব দল প্রতিষ্ঠার যে অন্যন্য সাধারন অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন তা সুবিদিত ও অবিস্মরনীয়। এই মহান নায়ক শুধু রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা ও সে সবের পরিচালনারই নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেননি। তিনি প্রগতিশীল ও গনতান্ত্রিক আন্দোলনের অনেক নেতা ও অসংখ্যকর্মী সৃষ্টি করেছেন।

মওলানা ভাসানী ছিলেন মজলুম জননেতা এবং জনগনের সংগে ছিল তাঁর আজীবন ঘনিষ্ঠ সুগভীর সম্পর্ক। বস্তুতঃ ভাসান চরের মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক আর্বিভাব ও উথান ঘটেছিল বৃটিশ শাসনামলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ছত্রছায়ায় এদেশের জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচার নিপীড়ণ এবং শোষন বঞ্চনার শিকার জনগনের মধ্যে থেকেই। জনগনের মধ্যেই তাঁর রাজনৈতিক জীবন এবং সংস্কারকামী কর্মধারার শিকড় প্রোথিত ছিল বলেই তিনি আজীবন তাদের সংগে এবং তাদের উথান ও মুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রাম করে গেছেন। পোষাক আশাকে এবং জীবন যাপনে তিনি ছিলেন অতি সাধারন এবং জনগনেরই একজন, উপমহাদেশের অনেক খ্যাতিমান ও বরেন্য এবং উচ্চবিত্ত ও উচ্চ শিক্ষিত রাজনৈতিক নেতার সংগে

Dhaka University Institutional Repository

এখানেই ছিল মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর পার্থক্য। উচ্চকোটিতে অবস্থান না করে ভাসানী জনগনের সংগে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। জনগনের এবং দেশ ও জাতির স্বার্থে তাঁদের স্বপক্ষে সংগ্রাম করতে গিয়ে মওলানা ভাসানী তাঁর রাজনৈতিক জীবনে অনেক দমননীতির শিকার হয়েছেন। বহুবার কারাবরণ করেছেন। তবুও স্বদেশী বিদেশী শাসক শোষক দেয় বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি পিছপা হননি। মওলানা ভাসানী ছিলেন আজীবন স্বাধীনচেতা গনতন্ত্রমনা এবং শোষন বঞ্চনা ও অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ। প্রয়োজনে এবং দেশ ও জনগনের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি কখনো কখনো বুর্জোয়া গনতন্ত্রের ও নির্বাচনের রাজনীতির বিরোধীতার করেছেন। জনকল্যান ধর্মী প্রকৃত গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকেই তিনি মূল্য দিয়েছেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদী, উপনিবেশবাদী, আধিপত্যবাদী এবং আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে এবং সংগ্রামে প্রেরনা যুগিয়েছেন।

দেওবন্ধ মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত মওলানা ভাসানী ছিলেন ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্যও মূল্যবোধে বিশ্বাসী এবং সাম্য ন্যায় ও কল্যানের নীতিতে আস্থাবান। তিনি ছিলেন একাধারে ধর্মীও নেতা ও আধ্যাত্মিক সাধক। নিবেদিত প্রাণ এই মহান নেতা ছিলেন প্রগতিবাদী এবং সব ধরনের সংকীর্নতা ও সাম্প্রদায়িকাতার ঘোর বিরোধী, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব দারিদ্রপীড়িত শোষিত বঞ্চিত মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তিই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি আজীবন সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। মওলানা ভাসানী ছিলেন শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার অনুরাগী এবং তিনি তাঁর দীর্ঘজীবনে বিভাগ পূর্বকালে ও পরবর্তীকালে ও বাসস্থানে এমন কি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, মুসাফিরখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছেন। সন্তোষে ইসলামী বিশ্বাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তার শিক্ষানুরাগ ও সংগঠনী ক্ষমতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মওলানা ভাসানী এদেশের জনগনের গনতান্ত্রিক আন্দোলন ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামে যেমন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তেমনি আমাদের কষ্ঠার্জিত স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সংরক্ষনের সংগ্রামেও প্রেরণার উৎসাহ হয়ে আছেন। আমাদের স্বতন্ত্র

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয়তা এবং সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্র রক্ষা এবং সব ধরনের আগ্রাসন প্রতিরোধে ও নায্য অধিকার আদায়ে মওলানা ভাসানী এক অনিঃশেষ প্রেরনার উৎস। 'ফারাক্কা বাঁধ' যে বাংলাদেশের জন্য 'মরন ফাঁদ' এটা মওলানা ভাসানী আগেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই দেশ ও জনগনের বৃহত্তর স্বার্থেই মওলানা ভাসানী সুবিশাল প্রতিবাদী মিছিল "ফারাক্কা লং মার্চ" এ নেতৃত্ব দিয়ে এক অনুপ্রেরনাদায়ক দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তিনি সারা জীবন মানুষের সঙ্গে থেকেছেন, তাঁদের জন্য কাজ করেছেন এবং তাদের সাথে সংগ্রাম করেছেন।কোনদিন ক্ষমতায় যাননি।যদিও তাঁর দল পূর্ববংগে ও পাকিস্তানের কেন্দ্র সরকার গঠন করেছিল একাধিকবার।অবশ্য ক্ষমতায় না গিয়েও তিনি কিংবদন্তি সৃষ্টি করেছিলেন রাজনীতিতে। ব্যক্তি জীবনে ইসলামের চর্চা ও প্রচারে তাঁর ভূমিকা তাঁকে রাজনৈতিক নেতার পাশাপাশি একজন কামেল পীরের পরিচয় এনে দেয়। ধর্ম ও রাজনীতির এই বিরল সহবস্থানের উপর ভিত্তি করে তাঁর জীবনের শেষবারের আবাসস্থল টাংগাইলের সন্তোষে প্রতিষ্ঠিত হয় মওলানার দরবার শরীফ। পীরের মুরিদদান ও রাজনৈতিক অনুসারীদের মিলনভূমি সন্তোষে মরহুম জননেতার মাজার এখনও ভক্তকুলের পীঠস্থান।

Dhaka University Institutional Repository

জন্ম শিক্ষা ও পারিবারিক বৃত্তান্ত ঃ

কবে থেকে মওলানা ভাসানীর জীবনের শুরু সে কথা কেউ হলফ করে বলতে পারেনা, যে পরিবারে এবং যে সময়ে তার জন্ম সে পরিবারে তখন কোষ্টি করে জন্ম তারিখ টুকে রাখার কোন ব্যবস্থা ছিলনা, অতি সাধারন পরিবার থেকে তিনি উঠে এসেছেন এবং গোটা পরিবারের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম তিনি।

সমাজের ক্ষুদ্র এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহন করে একজন অনাথ বালক কিভাবে সাহসের সঙ্গে জীবনের সকল প্রতিকুলতা উপেক্ষা করে সব জাতি গোষ্ঠির মাঝে বিরাট মাপের একজন রাজনৈতিক নেতা ও শিক্ষক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায় তারই স্বাক্ষর মেলে মওলানা ভাসানীর জীবনে। ক্ষুদ্র কিভাবে বিলাশত্ব অর্জন করে তারই প্রানবন্ত কাহিনী মওলানা ভাসানীর জীবন। মওনালা ভাসানীর জন্ম সিরাজগঞ্জ শহরের অদুরে ধানগড়া গ্রামের অস্বচ্ছল এক কৃষক পরিবারে, বিভিন্ন সময়ে মওলানা ভাসানীর কাছে জানতে চেয়ে এবং তাঁর আত্নীয় স্বজনের কাছ থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে তাঁর জন্ম ১৮৮০ থেকে ১৮৮৫ সালের কোন একসময়। তবে তাঁর পাসপোর্টে ব্যবহৃত জন্ম তারিখ ১৮৮০ সালের ১২ ডিসেম্বর কে গ্রহণ যোগ্য তারিখ বলে গণ্য করা যায়।

মওলানা ভাসানীর বাবার নাম শরাফত আলী খান। মায়ের নাম মজিরন বিবি। তাঁর পিতার সামান্য কিছু ভূসম্পত্তি ও সিরাজগঞ্জ বাজারে একটি দোকান ছিল। তিন পুত্র এক কন্যার পরিবারের মধ্যে আবদুল হাকিম খান ছিলেন দ্বিতীয় পুত্র। তাঁর বড় ভাইয়ের নাম আমির আলী খান ও ছোট ভাইয়ের নাম ইসমাইল খান। বোনের নাম কুলসুম খানম। আব্দুল হামিদ খানের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তাঁর পিতা মারা যান।

বাল্য কালে আবদুল হামিদ খান (ভাসানীর) ডাক ছিল চ্যাগা মিয়া। সম্ভবতঃ ১৮৯৪ সালে সিরাজগঞ্জ এলাকায় ওলাওঠা মহামারী আঘাত হানে। এই মহামারীতে চ্যাগা

Dhaka University Institutional Repository

মিয়ার মা, দুই ভাই ও বোন মারা যায়। চ্যাগা মিয়া কোন মতে বেঁচে যান। মায়ের মৃত্যুর পর চ্যাগা মিয়া আশ্রয় নিয়েছিলেন চাচার গৃহে।

সময়টা উনিশ শতকের শেষ দিকের মাঝামাঝি। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন কিছুটা দস্যি ও দুরন্ত প্রকৃতির। সে যুগে হিন্দুদের বর্ণবৈষম্যের মত মুসলমান সমাজেও আশরাফ আতরাফের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। কথিত আছে, একদা তাঁর চাচার গৃহে কোন এক সামাজিক ভোজনের আয়োজন ছিল। ভদ্রলোকেরা থালায় আলাদা খাচ্ছে আর গরিবরা খাচ্ছে কলাপাতায় অন্যত্র মাটিতে বসে। হামিদের এক খেলার সাথী যে গরিব ছেলে অর্থাৎ আতরাফ শ্রেনীভূক্ত তাকে তিনি জোর করে ভদ্রদের আসনে বসিয়ে দেন। কারণ সেখানে খাওয়া-দাওয়ার উপকরন ও ছিল কিছুটা ভিন্ন। এই ঘটনায় তার চাচা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বকাঝকা ও মারধোর করেন। এতে অভিমান করে হামিদ চাচার বাড়ী থেকে পালিয়ে যান এটা ছিল তাঁর জীবনে প্রথম আপোষহীন বিদ্রোহ। প্রিয়জনহীন হামিদের শুরু হলো অন্য জীবন, বাধাবন্ধনহীন মুক্ত সে জীবন।

দারুন দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে কাটে তার শৈশবের দিনগুলি। গৃহহীন চ্যাগা মিয়া ঘুরে বেড়িয়েছেন গ্রাম -গ্রামান্তরে আশ্রয় নিয়েছে অজানা অচেনা অনেক গৃহে। মাঠে ঘাটে ও ক্ষেত খামারে কাজ করেছেন কৃষকের সাথে। যমুনা নদীতে মাছ ধরেছেন জেলেদের সাথে। এমনিভাবে কখনো দু চার আনা উপার্জন করে খেয়েছেন। আবার বহুদিন তাঁর কেটেছে অনাহারে বা অর্ধাহারে।

ঐ সময় শাহ নাসিরউদ্দিন বোগদাদী নামে এক ইরাকী আলেম ও ধর্মপ্রচারক সিরাজগঞ্জে আসেন। শাহ নাসির উদ্দিন নিরাশ্রয় হামিদকে তাঁর আস্তানায় লালন-পালনের জন্য গ্রহণ করে। কয়েক বছর তিনি সেই পীর সাহেবের আশ্রয়ে মানুষ হন। তাঁর কাছে ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষায় দীক্ষিত হন। শৈশবে গাঁয়ের মক্তবে কয়েক বছর লেখপড়া করেছিলেন হামিদ। তারপর পীরের সংস্পর্শে এসে আরবী ও ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করেন। সেই যে তাঁর জীবনে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চেতনার শিখা জ্বলে উঠে তা

Dhaka University Institutional Repository

অম্লান ছিল আমৃত্যু। পীর সাহেবের আশীবাদ ও সুপারিশ নিয়ে তিনি যান যুক্ত প্রদেশের দেওবন্দ ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্রে, অবশ্য তা অনেক পরে, সেখানে অল্প দিন অধ্যয়ন করে আবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

বস্তুতঃ এ সময় তার জীবনে কোন স্থিরতা ছিল না, এক স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়ানোই ছিল তাঁর কাজ। উত্তর বংগ ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চল চষে বেড়ান তিনি। পীরের আদেশে তিনি একবার বাগদাদেও গিয়েছিলেন। ভ্রাম্যমান হযরত নাসিরুদ্দিন বোগদাদী একসময় আসামের জলেশ্বরে তার স্থায়ী হুজতা স্থাপন করেন। সেখানেও তার সেবার দায়িত্ব নেন ভাসানী।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছর আগে ঘুরতে ঘুরতে একবার তিনি বগুড়ার পাঁচবিবির জমিদার শামসুদ্দিন আহমেদ চৌধুরীর বাড়ীতে যান। সেখানে তিনি প্রথমবার মাস ছয়েক ছিলেন এবং জমিদার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় কিছুদিন মোদাররেসের কাজ করেন। তাঁছাড়া জমিদার বাড়ীতে গৃহশিক্ষকের কাজও করতেন। ঐ সময় তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ছিল জমিদারের পুত্রকন্যারা, তাঁদের একজন আলেমা খাতুন পরবর্তীকালে ভাসানীর সহধর্মিনী।

হামিদের সাহস, সততা, কর্তব্য নিষ্ঠায় পাঁচবিবির জমিদার তাঁর উপর ধীরে ধীরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এমনকি জমিদারী সংক্রান্ত নানা ব্যাপারেও তিনি হামিদকে দিয়ে কাজ করাতেন। ভাবী-শ্বশুরের মামলা মোকদ্দমা পরিচালনার ব্যাপারে তাঁকে মাঝে মাঝে কলকাতায় যেতে হতো। কলকাতায় তিনি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের কতিপয় কর্মীর সংস্পর্শে আসেন। সেই সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে প্রায়ই আব্বাস আলী মীরের স্মরন করতেন তিনি।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদীদের আন্দোলনের উদ্দেশ্যটাকে পছন্দ করতেন ভাসানী, কিন্তু উপায়কে অনুমোদন করতে পারেননি। তা'ছাড়া সে আন্দোলনও ছিল তখন প্রাথমিক পর্যায়েই। সে সময় তিনি উপলব্ধি করেন যে, সন্ত্রাসবাদীরা

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চশিক্ষিত এবং মুক্তি সংগ্রামে নিবেদিত হওয়া সত্ত্বেও জনগনের রাজনৈতিক সচেতনাতার অভাবে পর্যাপ্ত জনসমর্থন পাচ্ছেন না। এ'ছাড়া সন্ত্রাসবাদীদের লুটতরাজ ও ডাকাতির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারটি ছিল তাঁদের জনপ্রিয়তা অর্জনের পথে অন্তরায়। এ'সব ভেবে তিনচার বছর সন্ত্রাসবাদীদের সংগে থেকে এক সময় সম্পর্কচ্ছেদ করেন।

পাঁচবিবির জমিদার বাড়ীর সঙ্গে প্রায় বছর দশেক ছিলেন হামিদ, এমনকি একসময় ওটাই হয়ে উঠে তাঁর অস্থায়ী ঠিকানা। সুস্বাস্থের কারণে জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীর সর্দারও হয়েছিলেন তিনি। পাঁচবিবি থাকাকালীনই তিনি প্রথমবার হজ্জব্রত পালন করেন জমিদারের সংগী হিসাবে।

চিত্তরঞ্জন দাসের জনসেবা ও দেশসেবার কর্মকান্ডের সংস্পর্শে আসার পর ভাসানী স্থির করলেন যে, আজীবন অকৃতদার থাকবেন এবং মানুষের মংগলে জীবন বিসর্জন দেবেন। কিন্তু দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁর মনের পরিবর্তন ঘটে এবং সংসারী হবার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯২৫ সালের শেষ দিকে প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে পাঁচবিবির জমিদারের মেয়ে আলেমা খাতুনের সংগে তাঁর বিয়ে হয়। তখন আলেমা খাতুনের বয়স আঠার উনিশ। আলেমা খাতুনের গর্ভে তিন ছেলে দুই মেয়ে জন্মগ্রহন করেন। প্রথম পুত্র আজিজুল হক শৈশবে মারা যান। দুই ছেলে দুই মেয়ে রিজিয়া খানম, আবু নাসের খান, গোলাম কিবরিয়া এবং মাহমুদা খানম।

মওলানা ভাসানী আরও দুটি বিয়ে করেছিলেন এবং দুটিই রাজনৈতিক প্রয়োজনে। দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন তিনি টাংগাইলের দীঘুলিয়া গ্রামের আব্দুর রহমান মেয়ে আকলিমা খাতুনকে। বিয়ের ছ'মাস পরেই আকলিমা খাতুন মারা যান।

তৃতীয়বার বিয়ে করেন তিনি বগুড়ার আদমদিঘি থানার কাঞ্চনপুর গ্রামের কাসেম আলী সরকারের মেয়ে বেগম হামিদা খাতুনকে। একটি মসজিদ দখল নিয়ে স্থানীয় মহারাজার সংগে এক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে এই বিয়ে করা তাঁর জন্যে অত্যাবশ্যক হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

পড়ে। তাঁর তৃতীয় পক্ষের শ্বশুর কাসেম আলী ছিলেন ভাসানীর একজন ভক্ত এবং তাঁর চেয়ে বয়সে পনর বিশ বছরের ছোট। বিয়ের সময় হামিদা খাতুনের বয়স ছিল বারো বছর, গর্ভে জন্মগ্রহণ করে এক ছেলে এবং দুই মেয়ে- আবু বকর, আনোয়ারা খানম এবং মনোয়ারা খনম। ১৯৬৪-র ডিসেম্বরে হামিদা খাতুন মারা যান।

বস্তুতঃ ভাসানীর দুটো বাসস্থান ছিলঃ একটি পাঁচবিবির বীনগরে শ্বশুর বাড়ীতে, অন্যটি টাংগাইলে। তবে সামান্য কুঁড়েঘরেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন তিনি। আসবাবপত্রবিহীন ছিল তাঁর কুটির। জনজীবনের সাথে ওতপ্রোতজড়িত থাকার কারণে তিনি তাঁর সন্তান-সন্ততির সুখশান্তি ও নিরাপত্তার কথা ভাববার অবকাশ পাননি। ছেলেমেয়েদের নুন্যতম শিক্ষাও দিতে পারেননি তিনি।

আধুনিক ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না ভাসানী। তাঁর যেটুকু শিক্ষা তার প্রায় সবটাই ধর্মীয় কোরআন এবং হাদিস ভিত্তিক। কিন্তু এই উপমহাদেশে বৃটিশ যুগে সে দুটো ইসলামিক শিক্ষার ধারা ছিলো তার অপেক্ষাকৃত উদার নৈতিক ও প্রগতিশীল ধারার সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি।

মওলানা ভাসানী ছিলেন দেওবন্দ মতাবলম্বী আলেম। যদিও তৎকালীন ভারত বিখ্যাত আলেম মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মওলানা হোসেন আহমদ মাদানী প্রমুখের বিরুদ্ধতা করে মুসলিম লীগে যোগদান করেছিলেন, তবু জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি দেওবন্দ স্কুলের মূল শিক্ষা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধতা এবং জনগনের কল্যাণ-এ দু'টি মূলনীতি বিস্মৃত হননি।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিতে হাতে খড়ি ঃ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর সারা উপমহাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী এক দশককাল মওলানা ভাসানীর জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল। এই সময় কালে তিনি পাক ভারত উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় বেশ কয়েকজন ইসলামি চিন্তাবিদ ও রাজনীতিকের সাহচার্য লাভের সুযোগ পান। তাঁদের মধ্যে মওলানা মোহাম্মাদ আলী, মওলানা শওকত আলী, আল্লামা আজাদ সোবহানী, মওলানা হাযরত মোহানী, মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের বিপ্লবী ও ইসলামি সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় তিনি দারুনভাবে প্রভাবিত হন।

১৯১৭ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ময়মনসিংহে আসলে তাঁর জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয় মওলানা ভাসানীর, দেশবন্ধুর জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ভক্ত হয়ে যান তিনি, চিত্তরঞ্জন দাসের ভক্ত মওলানা মোহাম্মদ আলীর অনুপ্রেরনায় তিনি ১৯১৯ সালে কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং সেই থেকে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন।

আব্দুল হামিদ খান ৩৪ বছর বয়সে সার্বক্ষনিক রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। এরপর অতি অল্পসময়ের মধেই তিনি গুরুত্বপূর্ণ নেতা রূপে উঠে আসেন। এর মূল কারণ ছিল-তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা, নিজ রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি অবিচলতা এবং দূরদর্শিতা। আব্দুল হামিদ খানের রাজনীতি ছিল-গরীবের মুক্তি, অন্যায়ের প্রতিরোধ আর শোষিতের পক্ষের রাজনীতি। তিনি যখন রাজনীতিতে প্রবেশ করেন তখন তিনি একজন অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক মানুষ। বাংলার নেতাদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র (১৮৫৮-১৯৩২) চিত্তরঞ্জন দাশ এবং সুভাষ চন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫) বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেন তাঁকে। তাঁর পরিকল্পনা ছিল ধর্ম ও রাজনীতি, উভয় পথেই কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানো, রাজনীতিতে প্রবেশের পর ভাসানীর জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা খিলাফৎ আন্দোলন, কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য হিসাবে থাকা অবস্থায় আব্দুল হামিদ খান ১৯১৯ সালে এই আন্দোলনে অংশগ্রহন করেন এবং কারাবরণ করেন। সেটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম কারাবাস।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিতে প্রবেশের পর আব্দুল হামিদ খানের জীবনে অসহোযোগ আন্দোলন একটা গুরুত্বপূর্ন ঘটনা। ১৯২০ সালে ১ অগাষ্ট গান্ধী অসহোযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এরপর মুসলমান ও কংগ্রেস নেতারা গান্ধীর নেতৃত্বে একত্র হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে।

১৯২১ সালে চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় মওলানা ভাসানী তাতে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহন করেন। ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বরে উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা ও মহামারী দেখা দিলে সেখানে ত্রানকার্যের জন্য বাংলার প্রখ্যাত নেতারা প্রায় সকলেই উপস্থিত হন। প্রফুল্লচন্দ্র রায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাস বসু প্রমুখ দেশবরেন্য নেতাদের সহকর্মী হিসাবে কাজ করে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষন করেন ভাসানী। তাঁর পরার্থ পরতায় এবং পরিশ্রম করার প্রবনতায় মুগ্ধ হয়ে দেশবন্ধু তাঁকে ময়মনসিংহের ত্রানশিবিরের উপনেতা নিযুক্ত করেন।

মওলানা ভাসানী তাঁর এক নিবন্ধে লিখেছেনঃ "বাংলা ১৩২৯ সালের বন্যা আমার ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবনে বিপুলভাবে নাড়া দিয়েছিল। সেই সনে উত্তরবংগে এক অভাবনীয় বন্যা হয়েছিল। আমার স্পষ্ট মনে আছে, অতিবৃষ্টির দরুন শান্তাহার জংশনে কোমর সমান পানি হইয়া গিয়াছিল। রিলিফের কাজে আমরা কয়েকজন সেখানে পৌছাইয়া কিভাবে কি করা যায় ভাবিতে ছিলাম। একদিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস আসিয়া হাজির, সংগে ছিলেন বাংলার বিপ্লবী সন্তান সুভাষ বসু। দেশবন্ধুর হাতে দশ সের চিড়ার একটা পোটলা ছিল। উহা লইয়া তিনি যখন পানিতে নামিয়া পড়িলেন তখন আমরা কেহ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি নাই। এই স্মৃতিচারন আমি কতদিন করিয়াছি। ভাবিয়াছি এটা বুঝি আমার রাজনৈতিক জীবনে খুব একটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল"।

১৯২২ এ চিত্তরঞ্জনের সাথে গান্ধীর মনোমালিন্য হয় এবং কংগ্রেসের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি স্বরাজ্য দল গঠন করেন। চিত্তরঞ্জন ও সুভাষ বসুর তেজস্বিতায় মুগ্ধ হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

ভাসানী বিশেষ করে উত্তর বাংলার গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেস ও স্বরাজ্য দলের পক্ষে কাজ করতে থাকেন এবং জমিদারের অত্যাচারে অতীষ্ট কৃষকদের সমস্যা নিয়ে খ্যাতনামা রাজনৈতিক নেতাদের সংগে পরামর্শ করেন এবং কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলেন।

১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদান করেন। শাসক গোষ্ঠী চক্রান্ত করে ভাসানীকে পূর্ব বাংলা থেকে আসামে বিতারিত করেন। সারাজীবন তিনি বাংলার নির্যাতিত কৃষকদের দুঃখ বেদনা মোচনের কথা বলেছেন। অষ্টক মোল্লার কৃষক বিদ্রোহে সামন্তরাজাদের সংগে সংঘর্ষে ভাসানীর জীবন বিপন্ন হয় পড়ে। তখন নিরাপত্তার প্রয়োজনে ভাসানী টাংগাইলের কাগমারীতে এক মক্তবে শিক্ষকতার পাশাপাশি জমিদার ও সুদখোর মহাজনদের বিরুদ্ধে দরিদ্র কৃষকদের সংঘবদ্ধ করতে থাকে। মহারাজা ইংরেজ প্রশাসনের সাহায্যে তাঁকে টাংগাইল থেকে বিতাড়িত করেন।

শত শত বছর ধরে দরিদ্র কৃষকেরা এসব বিলাসী স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী মহারাজা ও জমিদারদের অধীনে জীবন যাপন করছিল। ভূ-স্বামীরা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে প্রজাসাধারনের উপর অকথ্য অত্যাচার করত। ভাসানী তাঁদের অধিকার আদায়ের জন্য শুরু করলেন আন্দোলন। টাংগাইল ও গৌরীপুরে তিনি জমিদার ও মহারাজার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জনগনকে সংগঠিত ও উত্তেজিত করে তোলেন। এসব ভূ-স্বামীয়া একজোট হয়ে ভাসানীর বিরুদ্ধে সরকারের সাহায্য কামনা করেন। স্বাধীনতা ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের চাপে বৃটিশ সরকার তখন বিব্রত ছিল। তাই রুশ বিপ্লবের পরপরই কৃষকদের এই ধরনের আন্দোলনকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকেন পরে ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসকের আদেশে এলাকার শান্তি শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে ভাসানীকে ময়মনসিংহ জেলা থেকে বহিস্কার করা হয়। নানা ষড়যন্ত্রের মুখে মওলানা ভাসানী তাঁর পূর্ব পরিচিত আসামের ধুবড়ী জেলায় চলে যেতে বাধ্য হন। তিনি স্থির করেন যে, সমাজের সর্বহারা, অধ্যো সর্বহারা ও পদানত মানুষের মুক্তির যে রাজনীতি বিশেষ করে সামন্ত জমিদারের অত্যাচার ও শোষনের কবল থেকে বাঙ্গালী দরিদ্র কৃষকের মুক্তির যে দীক্ষা তিনি নিয়েছেন তাতে নিজেকে নিয়োজিত

Dhaka University Institutional Repository

রাখবেন। সেই লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন এবং ১৯২৪ সালে আসামের ধুবড়ী জেলায় ভাসানচরে বাঙ্গালী কৃষকদের এক বড় সম্মেলন করেন। সেই সম্মেলনের সাফল্যে লোকে তাকে হামিদ মৌলবী না বলে ডাকতে শুরু করলো "ভাসানীর মওলানা", সেটাই ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হলো "মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীতে", এখানে তিনি কাজ করতে গিয়ে একজন কৃষক নেতা ও একজন ধর্মীয় আধাত্মিক পীর হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় - ৩

মওলানা ভাসানীর আসামের রাজনীতি।

(১৯২৭-১৯৪৭) ইং

Dhaka University Institutional Repository

আসামের মাটিতে পা রেখে মওলানা দেখলেন এক অসহনীয় দুঃখ দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন কয়েক লাখ বাঙ্গালী, আসামের জনসংখ্যা তখন সব মিলিয়ে ১৬ লাখ। এদের মধ্যে বাঙ্গালী ৫ লাখ। খাদ্যের আশায় ও কর্মের সন্ধানে তখন এই সব বাঙ্গালীরা বাস্তুত্যাগী, নিজ দেশে অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আশ্রয় নেই। আসামের বিরান জনপদে তাই তখন চলছে বসত গড়ার প্রতিযেগিতা। এই নতুন বসত আসামের জন্য সৃষ্টি করলো এক নতুন সমস্যার। সেখানে দেখা দিল জাতিতে জাতিতে সংঘাত, ভাষায় ভাষায় সংঘাত, চলন বলনে সংঘাত। অসমীয়ারা বাঙ্গালীদের মেনে নিতে রাজী নয়। বৃটিশ সরকার লাইন করে সীমানা দিয়ে ভাগ করে দিয়েছিল দুই সম্প্রদায়ের বসবাসেরর জন্য। বাঙ্গালীদের ভাগে যে এলাকা পড়ল তাতে তাদের স্থান সংকুলান হলনা। কিন্তু তবুও মাথা গুজে থাকতে হয়। লাইন ভাঙ্গার কোন উপায় নাই।

ভুমিহীন বাঙ্গালী চাষী মজুরের প্লাবন গতি যখন আসামের বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতিপক্ষ হিসাবে বিবেচিত হতে থাকল তখন সরকার ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল তার গতিরোধ করার জন্য আইনগত প্রথা প্রবর্তন করেন। তাই 'লাইন প্রথা'। এই প্রথার বিধান অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে আগত বাঙ্গালী কৃষকদের জমিজামা বসতবাড়ি উচ্ছেদের অভিযান তাই 'বাঙ্গাল খেদা'। এই পরিস্থিতিতে এক রকম ধর্মাবতারের ভুমিকা নিয়েই বাঙ্গালীদের মাঝে উপস্থিত হন মওলানা ভাসানী।

মওলানা ভাসানী ও লাইন প্রথা ঃ

১৯৩৮ সালের কোন এক সময় আসামে 'লাইন প্রথা' নিয়ে এক তীব্র আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, এ আন্দোলন চলছিলেন প্রায় দীর্ঘ দশ বৎসর, ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। আন্দোলনের নেতা ছিলেন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।

প্রথম প্রথম তিনি বহিরাগতদের সমস্যা নিয়ে কর্তৃপক্ষের সংগে আলাপ আলোচনা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে কোন সুফল পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত তিনি

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্ত নেন সংগ্রাম এবং সহিংস সংগ্রামই জালেমের জুলুম থেকে রেহাই পাবার অনন্য পথ। তিনি সরকারের দমন নীতির প্রতিবাদ করার জন্য আসামের বহিরাগত কৃষকদের সংঘবদ্ধ করতে থাকেন, তাদের একটি সংগঠন গড়ে তোলেন যার নাম দেয়া হয়েছিল "আসাম চাষী মজুর সমিতি"। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন মওলানা ভাসানী নিজে আর সম্পাদক ছিলেন নুরুল হক নামক জনৈক বহিরাগত কৃষক।

তিনি শুধু বাঙ্গালী কৃষকদের বসতি ও জমিজামা পাওয়ার অধিকারের জন্য লড়ছিলেন না, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বিপক্ষেও লড়েছিলেন। 'লাইন প্রথা' বিরোধী আন্দোলনের সাথে তিনি জুড়ে দেন ভাষা, সংস্কৃতি রক্ষা, জমিদারি, মহাজনী প্রথা, কারচুপি বাতিল ও স্বাভাবিক ধর্মীয় অধিকার অর্জনের দাবিসমুহ।

মওলানা ভাসানী বঙ্গ আসামের নিগৃহীত মানুষদের বিভক্ত করতে চাননি। তিনি হিন্দু কৃষক, মুসলমান কৃষক, বাঙ্গালী কৃষক, অসমীয় কৃষক এভাবে না ভেবে বাংলা আসামের কৃষক নির্বিশেষে কৃষক প্রজা সমস্যার সার্বিক সমাধান চেয়েছিলেন কংগ্রেসের বিরোধিতা ও লীগের সুবিধাবাদ এই দুই অবস্থার মধ্যে 'লাইন প্রথা' বিরোধী আন্দোলনের বক্তব্য, কর্মসূচী ও নির্দেশ জনসাধারনের কাছে পৌঁছানোর জন্য আন্দোলনের মাসিক মুখপত্র 'পয়গাম' প্রকাশ করেন। বিভিন্ন লেখার মধ্যে দিয়ে বাঙ্গাল খেদা অভিযান বন্ধের যুক্তি ও বক্তব্য পেশ করে আন্দোলন গড়ে তোলা ও জনমত সৃষ্টির আহবান জানানো হতো।

এই 'লাইন প্রথা' বিরোধী আন্দোলনের সময়ই কায়েমী স্বার্থবাদী মুসলীম লীগ নেতাদের সংগে ভাসানীর মতান্তর ঘটে। তখন মুসলীম লীগের নেতা স্যার সা'দুল্লাহ আসামের মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী ও সরকারের বিরুদ্ধেই তিনি পরিষদের মধ্যে ও বাইরে তীব্র সমালোচনা করতে থাকেন । ঐতিহাসিক বরপেটা সম্মেলনের সময় কেন্দ্রীয় মুসলীম লীগ নেতারা ভাসানীকে শান্ত করার চেষ্টা করেন এবং মুসলিম লীগ ও স্যার সা'দুল্লাহর স্বার্থে 'লাইন প্রথা' বিরোধী আন্দোলন থেকে সাময়িক ভাবে ভাসানীকে বিরত থাকার পরামর্শ দেয়া হয় কিন্তু ভাসানী সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন এবং বলে

Dhaka University Institutional Repository

"মানুষের জন্যই রাজনীতি ও সরকার, বিবেকহীন অত্যাচারী সরকারকে রক্ষা করার স্বার্থে রাজনীতি নয়, অন্তত সে ধরনের রাজনীতি তে তিনি নেই"[১]। তাঁর এই বক্তব্য থেকেই সহজেই পরিস্ফুটিত হয় -মওলানা ভাসানী বাকসর্বস্ব কর্মবিমুখ পোশাকী লীগ নেতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন সত্যিকারের একজন জননায়ক।

কৃষক সাধারনের নায্য দাবী দাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে এবং অত্যাচারী ও শোষকের হীনকার্য্যকলাপ প্রতিহত করার প্রয়োজনে ভাসানী শুরু থেকেই নানা রকম নিয়মতান্ত্রিক কৌশল অবলম্বন করতেন। ১৯৩২- এ ভাসানী প্রথম আমরণ অনশন ঘোষনা দেন ধুবড়িতে সেটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম "অনশনের রাজনীতি"।

বাঙ্গাল ভাসানী মূল উৎপাটিত বাঙ্গালী ভুমিহীন, ঠিকানাহীন ভেসে বেড়ানো জনগোষ্ঠীর পেটের ভাত, মাথা গোজার ঠাঁইহীনতা ও জীবনের সার্বিক অনিশ্চয়তার প্রশ্নটা নিজ জীবন ও বাস্তবতার নিরিখে গভীর মানবিক মমত্ববোধের সাথে একাত্ম হয়ে কিছু একটা করার দায়িত্ববোধ করেছেন বলেই 'লাইন প্রথা' ও 'বাঙ্গাল খেদা' বন্ধের প্রয়োজনীয়তা মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন।

আসাম জুড়ে যখন ভাতহীন, ঘরহীন মানুষের বাঁচার তীব্র লড়াই চলছিল তখন ঘোষিত দাবি দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে তিনি তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে খাজনা বন্ধ, বিনা টিকিটে বাস-রেল ভ্রমন, গ্রামগঞ্জ হাটবাজারে কৃষিপন্য বেচা কেনা ও অফিস আদালত বয়কটের কর্মসূচী দিলেন। ধাপে ধাপে আন্দোলনকে চুড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সারা আসামে "কালো দিবস" পালন ঘোষনার মাধ্যমে অসহযোগ আন্দোলনের উদ্বোধন করেন। ঘরে ঘরে কালো পতাকা উত্তোলন, মসজিদ মন্দিরে জালেমের ধ্বংস ও জুলুমের অবসানের উপর মজলুমের বিজয় কামনা প্রার্থনার কর্মসূচী দিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসুচী হয়ে দাড়ালো ভাসানীর একক সিদ্ধান্তের ফল।

(১) ভাসানী ১ম খন্ড সৈয়দ আবুল মকসুদ পৃ ঃ ৯১

Dhaka University Institutional Repository

খ্যাপা ভাসানীর দুর্বার গণআন্দোলনের মুখে অবশেষে আসাম সরকার জনগণের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ১৯০৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী বার্তা সংস্থা ওরিয়েন্ট প্রেসের কাছে এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী স্যার সা'দুল্লাহ ঘোষনা করেন "আসাম থেকে 'লাইন প্রথা' তিন বছরের জন্য বিলোপ করা হবে" তিনি বলেন "সরকার সমুদয় অকর্ষিত জমির তিরিশ শতাংশ সরকারী কাজে ব্যবহারের জন্য রেখে অবশিষ্ঠাংশ আদি অধিবাসী ও উদ্ধাস্তুদের মধ্যে বন্টনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন"।[১]

এই 'লাইন প্রথা' প্রশ্নেই সা'দুল্লাহর মুসলিম লীগ সরকারের পতন ঘটে এবং পতনের মূলে ভাসানী। ভাসানীর বিরোধীতার মুখেই পরিষদে সা'দুল্লাহর সরকার সংখ্যা গরিষ্ঠতা হারিয়ে ফেলে এবং গোপীনাথ এর নেতৃত্বের কংগ্রেসে কোয়ালিশন মন্ত্রী সভা গঠিত হয়। 'ভাসানীর আন্দোলনের ফলে সা'দুল্লাহর মন্ত্রীসভা সংকটে পড়ে এবং বাধ্যহয়ে সরকার অন্ততঃ এক লক্ষ বহিরাগত কৃষকের জমি বরাদ্দ করার কথা ঘোষনা করে'[২]।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ঃ

১৯৪৪ সালের ৭-৮ এপ্রিল আসামের বরপেটার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল দলের জন্য গুরুত্বপূর্ন সম্মেলন। এই সম্মেলনে তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। এর আগে তিনি ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছিলেন।

পাকিস্তান আন্দোলনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যেই ভাসানীর সে সম্মেলন আহবান করে। আসাম হেরাল্ড পত্রিকার মতে, ভাসানী নিজেই সে সম্মেলনের আহ্বান করেন এমন কি দলের সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গেও পরামর্শ করেননি ।

(১) Dev and Lahiri – Star of India, 25 February,1941.
(২) Dev and Lahiri – Star of India, 25 February,1941.

Dhaka University Institutional Repository

সম্মেলনের প্রাক্কালে খাদেমুল কওম, আব্দুল হামিদ খান (ভাসানীর মওলানা) নিবেদন শীর্ষক এক প্রচার পত্রে বলেনঃ " আসামের বার টি জেলার মুসলমান ভাইরা এই মহা সম্মেলনে সমবেত হইবে।এবং প্রস্তাব গ্রহন করিবে স্বাধীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য। পাকিস্তান অর্জন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে আমাদের অগ্রগতি অর্জন সম্ভব নয়। যে কোন পন্থায় আপনাদের জীবন ও ধন সম্পদের বিনিময়ে হলেও, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহন করুন"। [১]

"বৃটিশ সরকারের কঠোর সমালোচনা করে সেই বিশাল সমাবেশে ভাসানী স্যার সাদউল্লাহ প্রতি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগের আহ্বান জনান। আসাম সরকারের এক গোপন নথি থেকে জানা যায় যে, ভাসানীর ভাষনে সরকার ক্ষিপ্ত হন এবং তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারির ব্যবস্থা করা হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সাদউল্লাহ হস্তক্ষেপে তিনি কারায়বনে হাত থেকে রক্ষা পান"[২]।

বরপেটা সম্মেলনেই ভাসানী আসাম প্রদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। এর আগে কয়েক বছর তিনি ছিলেন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি। সম্মেলন পরবর্তী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি আসামের প্রত্যেকটি গ্রাম ও শহরে লীগের শাখা গঠন করেন, যা ছিল এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে আসামের সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায় লীগের পতাকার নীচে সমবেত হয়। তিনি মনে করতেন, মুসলমানদের ঐক্যই হবে "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ভিত্তি"।

১৯৪৫-৪৬ সালে আসামে কুখ্যাত "বাংগাল খেদা" আন্দোলন চরম আকার ধারন করে। সেখানকার বৃহত্তম হিন্দু প্রতিষ্ঠান "অহোম জাতীয় মহাসভা" ছিল সে আন্দোলনের উদ্যোক্তা। এই প্রতিষ্ঠানটি ৭ দফা দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন চালাতে থাকে দফাগুলো ছিল ঃ-

(১) Dev and lahiri – Star of India, 25, February 1941

(২) সৈয়দ আবুল মকসুদ মওলানা আব্দুল খান ভাসানী, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, মে ১৯৯৪

Dhaka University Institutional Repository

১। অসামীয় ও আসামের লোকদের মধ্যে বৈষম্য নির্ধারণ।

২। ভুমি ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আসামীয়দের বিশেষ সুবিধা প্রদান।

৩। বাইরে থেকে সহজে যাতে কেউ আসতে না পারে সেজন্য 'বহিরাগত আইন' প্রনয়ন।

৪। সিলেটের অধিবাসীদের আসামের সমস্ত চাকরী থেকে বিতারন।

৫। আসামীয়দের স্বার্থবিরোধী লোকদের নাগরিক অধিকার প্রত্যাহার ও তাদের জন্য নতুন 'বহিরাগত সার্টিফিকেট প্রদান।

৬। বিদেশীদের সকল প্রকার চাকুরী ও ব্যবসা বানিজ্যের সুবিধা লোপ।

৭। বহিরাগত ও বিদেশীদের ভুমি বিক্রয় আইন প্রনয়ন।

একদিকে মহাসভার সাধারণ সম্পাদক "বাংগাল খেদার" অবিসংবাদী নেতা অম্বিকাগিরি রায় চৌধুরীর আসমীয়দের স্বার্থ রক্ষার আন্দোলন অপরদিকে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানীর বহিরাগত বাঙ্গালীদের স্বার্থরক্ষার্থে পাল্টা আন্দোলনে আসামের সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থা হয়ে উঠে দূর্যোগপূর্ণ ।

১৯৪৬ সালে বাংলাদেশ, বিহার ও পাঞ্জাবে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা সংগঠিত হয়। কলকাতা ও নোয়াখালীতে বইলো রক্তের স্রোত। অথচ বাংলা সংলগ্ন আসামে যেখানে হিন্দু, মুসলমান, আসমীয় ও বহিরাগত বাঙ্গালীদের মধ্যে বিরোধ দীর্ঘদিনের সেখানে কোন ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দাংগা হলোনা। দাংগাপ্রবন সেই দিনগুলোতে ভাসানী সেখানে যে মানবতাবাদী ভুমিকা গ্রহন করেছিলেন সেই কর্মকান্ডের সংগে একমাত্র গান্ধীজীর কর্মের তুলনা চলে। তিনি ও তার অনুসারীরা সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে ছিলেন যে, বিরোধ ভিন্ন ধর্মালম্বীদের সংগে নয় শোষকের সংগে শোষিতের অত্যাচারীর সংগে অত্যাচারিতের।

১৯৪৭ সালের ২১ শে জুন মওলানা ভাসানীকে গৌহাটি জেল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। সংগে সংগে তিনি সিলেটের গনভোটের প্রশ্নে প্রচারনার অংশগ্রহন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এক বিরাট অংশ সিলেট প্রশ্নে আত্মনিয়োগ করে। মুসলিমলীগ নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে জনমত সৃষ্টি করেন যাতে সিলেটের জন সাধারন পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে কুঠার মার্কা বাক্সে ভোট দেন। একমাত্র মওলানা ভাসানীই দিয়েছিলেন অসাম্প্রদায়িক বিবৃতিঃ মওলানা সাহেব বলেন "গনভোটের সময় সিলেটকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে ভোট দেয়ার জন্য হিন্দু মুসলমান উভয়ের কাছে আমি আহবান জানাচ্ছি। অনেকেই পাকিস্তান সম্পর্কে সংখ্যালঘুদের মনে ভুল ধারনা জন্মাইবার অপচেষ্টা করিতেছে। আমি প্রত্যেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, তাহারা পাকিস্তানে সর্বপ্রকার সুবিধা ভোগ করতে পারবেন"[১]।

সিলেটের গনভোটে পাকিস্তানের পক্ষে গড়ে ২,৩৯,৬১৯ ভোট এবং ভারতের পক্ষে গড়ে ১,৮৪,০৪১ ভোট। পাকিস্তানের পক্ষে এই বিজয় অন্যান্য লীগ নেতার তুলনায় ভাসানীর অবদান আধিক ।

জীবনের সুদীর্ঘ ১৩ বছর আসামে প্রবাশ জীবন কাটিয়েছেন মওলানা। কখনো জেল খেটেছেন। কখনো গ্রেফতার এড়াতে গিয়ে পাহাড়ের গুহায় মগ্ন থেকেছেন ধ্যানে আসামে মওলানা ভাসানীর সংগ্রাম ছিল দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে এবং আসাম সরকারের বিরুদ্ধে। আসামে থাকাকালীন সময়ে সম্ভবত ১৯৩৭ সালেই মুসলিম লীগে যোগদান করেণ মওলানা ভাসানী। আসামেই তিনি জেল খেটেছেন ৮ বছর। আন্দোলন করে আসামের প্রাদেশিক পরিষদে নিশ্চিত করেছেন বাঙ্গালীদের জন্য ৯টি আসন। আসাম প্রবাসী বাঙ্গালীদের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি ১১ বছর ভোগ করেছেন আসাম আইন সভার সদস্যপদ।

আসাম মওলানাকে অনেক কিছু দিয়েছে, দিয়েছে গৌরব, দিয়েছে খ্যাতি। মওলানার রাজনৈতিক জীবনের রোমাঞ্চকর অধ্যায় কেটেছে আসামে। বিশের দশকের শেষ দিকেই সংখ্যাহীন জনহিতকর কাজ ও নিঃস্বার্থ মানবকল্যাণের জন্য আসামেই পরিণত হয়েছিলেন তিনি কিংবদন্তীর নায়কে।

(১) অর্ধ সাপ্তাহিক। জিন্দেগী ঃ- ৩০ জুন ১৯৪৭ কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় - ৪

মওলানা ভাসানীর পাকিস্তান সময়ের রাজনীতি।

(১৯৪৭-১৯৭০) ইং

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭-এ দেশ ভাগাভাগির পর মওলানা ভাসানীর যে রাজনৈতিক জীবন সে জীবন ঘটনাবহুল জীবন। পাকিস্তান আমলে তিনি শুধু রাজনীতির ভাঙ্গাগড়াই দেখেছেন। জেলে কাটিয়েছেন কম সময়।

১৯৪৮ সালে আসাম কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করার পর মওলানা ভাসানী তাঁর স্বপ্নের দেশ পাকিস্তানের পূর্বাংশে ফিরে আসেন এবং টাংগাইলের কাগমারীতে বসবাস শুরু করেন। পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসার পর মওলানা ভাসানী পাকিস্তানের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করেন। তখন রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি দেখতে পান পূর্ব বঙ্গে বৃটিশ পতাকার পরিবর্তে পাকিস্তানী পতাকা উড়ছে। প্রশাসনের কর্মকর্তা হিসাবে ইংরেজ ও হিন্দুদের স্থান দখল করেছে মুসলমানরা। কারও মাথায় জিন্নাহ ক্যাপ, আবার কারও মাথায় লিয়াকত আলীর সাহেবের ব্যবহৃত গোল টুপি। সোহরাওয়ার্দীর পরিবর্তে উজিরে আলার পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন ঢাকার নবাব খাজা নাজিমুদ্দিন। বাংলা ও আসামে মুসলিমলীগের যারা স্বীকৃত নেতা তাদের অনেকেই আসেনি পূর্ববংগে। যে জমিদার ও জোতদারদের বিরুদ্ধে তিনি এতদিন কৃষকদের জন্য সংগ্রাম করেছেন তাদের দাপটও কমেনি। কেবলমাত্র হিন্দু জমিদার ও জোতদারদের জমি দখল করে নতুন একদল মুসলমান জমিদার ও জোতদারদের জন্ম হচ্ছে। মুসলিম লীগের অবিভক্ত বাংলা প্রাদেশিক কমিটি ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। সর্বত্র মুসলিম লীগ দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে আছে। নতুন দেশের নতুন পরিবেশে নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরীর সূচনাতে এই সমস্ত পরিবর্তন মওলানা ভাসানীর মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে। আসাম জীবনেও বাঙ্গালী হিসাবে তাঁকে এবং তাঁর সহকর্মীদের নিগৃহীত হতে হয়। বাঙ্গালী জাতি সত্তার বিরুদ্ধে এখানেও তিনি তাঁর আসাম প্রতিপক্ষের প্রেতাত্মাদেরকে দেখতে পান।

স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান দুটো পক্ষ ছিলো কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ। দল দুটো ছিল উচ্চ মধ্যবিত্তদের দ্বারা পরিচালিত। উভয় দলই একই আদর্শে সঞ্জীবিত। উভয়েরই ঘোষিত লক্ষ্য ছিলো জনগনের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটানো। আসলে কিন্তু জনগনের মুক্তির কথাটা নিতান্ত ভাঁওতা, মূল উদ্দেশ্য

Dhaka University Institutional Repository

বৃটিশ পুঁজিপতিদের তাড়িয়ে নিজেরাই সেই শূন্য আসনে বসে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বদৌলতে ব্যক্তিগত মুনাফার পাহাড় গড়া।

১৯৪৭ সালে সে আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। ভারত হলো দ্বিধা-বিভক্ত। সৃষ্টি হলো পাকিস্তানের হাজার হাজার মাইলের দুরত্ব নিয়ে উপমহাদেশের দুই প্রান্তে দুটি দেশ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান। আজাদ পাকিস্তানের পূঁজিপতিরাও আজাদী লভ্যাংশ নিংড়ে নিংড়ে সিন্দুকে ভড়তে শুরু করেছিলো । অর্থনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রনের স্বরূপ দেখে জনগনের চোখ খুলে গেলো মুখ্যত কঠিন বাস্তবের আঘাতে স্বপ্ন হয়ে যায় খান খান। সোচ্চোর হয় জনগনের কণ্ঠ, আর সে জনগনের নেতৃত্ব দেন মওলানা ভাসানী।

অবিভক্ত ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেনী রাজনৈতিক দিক থেকে অধিক সচেতন ছিল বলে আসাম এবং বংগীয় মুসলিম লীগ সংগঠন হিসেবে ছিল অন্যান্য প্রাদেশিক মুসলিম লীগ থেকে অনেক শক্তিশালী। এখানে এটি একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল বা সংগঠন হিসেবে গড়ে ওঠে, অন্যত্র মুসলিম লীগ ছিল একটি মুসলমানের প্লাটফর্ম মাত্র। নির্বাচন মোকাবেলার জন্য ১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইন প্রণীত হবার পর এ.কে ফজলুল হক গঠন করেন 'কৃষক প্রজা পার্টি'। এ অঞ্চলের বেশীর ভাগ প্রজা ছিলেন মুসলমান এবং দরিদ্র কিন্তু জমিদাররা ছিলেন অধিকাংশই হিন্দু। এ'কারণে এখানকার জনসাধারনের মুক্তির আকাংখা ছিল প্রবল। তাই যে কোন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে তাঁদের অংশ গ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। বাংলার সাধারন মানুষের সেই রাজনৈতিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনকালে। মধ্যশ্রেনীর সক্রিয় ও পূর্ণোদ্যমে অংশ গ্রহনের কারনে বংগীয় মসুলিম লীগ অন্যান্য প্রদেশের মুসলিম লীগ সংগঠনের চেয়ে চরিত্রে ছিলো অধিক গণতান্ত্রিক।

এক হাজার মাইল ব্যবধানে পাকিস্তানের দুই অংশঃ পশ্চিম পাকিস্তান আয়তনে বড়। জনসংখ্যা কম, সম্পদ বেশী, পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানের আয়তন পশ্চিম পাকিস্তানের এক চতুর্থাংশ কিন্তু জনসংখ্যা বেশী। সম্পদ সামান্য, সাধারন অর্থনীতি পশ্চিমের তুলনায় অনগ্রসর। পূর্ব বাংলার জনগনের প্রধান উপজীবিকা কৃষিকাজ ও কুটির শিল্প এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সব ভাবাভাবী মানুষ গায়ে হাতে পায়ে বড় হওয়ার বহুযুগ থেকেই তারা অস্ত্র চালনায় পারদর্শী, তাই সেনাবাহিনী তাদের উপজীবিকার

মূখ্য কেন্দ্র। একারনে পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের পর তাদের চাকুরীর দরজা খুলে যায়। তা ছাড়া স্বাধীনতার প্রাক্কালে পাঞ্জাবে রক্তক্ষয়ী দাংগা হওয়ায় সেখানকার মুসলমান শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যায় এবং ব্যবসা বানিজ্যে আত্মনিয়োগ করে। এ জন্যে স্বাধীনতার পর পরই সেখানকার অর্থনীতি উৎপাদনমূখী হয়ে উঠে, লোকের কর্মসংস্থান হয় এবং সেই সংগে তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার হয়ে উঠে পূর্ব-পাকিস্তান। অধিকন্ত কাশ্মির-পশ্চিম পাকিস্তানের সংলগ্ন বলে যুদ্ধবিগ্রহ বাধলে পশ্চিম পাকিস্তানই ক্ষতিগ্রস্থ হবে এটা শাসকগন বুঝতে পারায় সেনাবাহিনীর উন্নতির দিকে অধিকতর নজর দেয়া হয় এবং মার্কিনসহ পশ্চিমা দেশ থেকে যতো সামরিক সাহায্য পাওয়া গেছে শুরু থেকেই তার সদ্ব্যহার হয়েছে ওখানেই। রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে থাকায় সেখানকার মানুষ যুগপৎ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সুযোগ-সুবিধা সর্বাধিক ভোগ করতে থাকে। এমনকি শুরু থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে।

এসব পরোক্ষ কারণে এবং রাষ্ট্রভাষা ইত্যাদির প্রশ্নে অবাঙ্গালী মুসলিম লীগ সরকার ও তাদের বাংগালী তাবকদের যথার্থ চেহারা বাঙ্গালীদের কাছে উন্মোচিত হয়ে পড়ে। দুই প্রদেশের মধ্যে বৈষম্যের সংগে সংগে বাড়তে থাকে সন্দেহ প্রবণতা এবং বাংগালীদের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অসন্তোষকে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগনের পশ্চিম পাকিস্তানের মনও বাঙ্গালীদের প্রতি বিষিয়ে উঠতে থাকে। এ'ভাবেই ইসলামের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যে শিথিল হয়ে পড়ে।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার আজন্মের বৈষম্য দুই অংশকে যেমন সংহত করতে ব্যর্থ হল তেমনি দু'খন্ড বিশিষ্ট দেশ সমগ্র পাকিস্তানের ভিত্তিতে কোন রাজনৈতিক দল বিকাশেরও পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে একমাত্র ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত অল্প কিছু দিনের জন্য ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ছাড়া সমগ্র পাকিস্তান পর্যায়ে কখনো কোন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়নি এবং পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একমাত্র ন্যাপেরই সুসম্পর্ক ও সুদৃঢ় লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী ছিলো। পাকিস্তানের মূলতঃ প্রথম বিরোধী দল আওয়ামীলীগও ছিল প্রাদেশিক সংগঠন ।

Dhaka University Institutional Repository

দেশে কোন সুসংহত ও শক্তিশালী রাজনৈতিক দল বিকাশ লাভ করুক এটা পাক সরকারের নেপথ্যের পরিচালক, সেনাবাহিনী ও আমলা শ্রেনী চাইতো না বলেই সম্ভবতঃ ন্যাপ প্রতিষ্ঠার বছর খানেকের মধ্যেই সরাসরি শাসন ক্ষমতায় সেনাবাহিনী চলে আসে আইয়ুব খানের নেতৃত্বে। আইয়ুব এসে শুধু যে, রাজনৈতিক দল সমূহ নিষিদ্ধ ঘোষনা করেন তাই নয়, তিনি যতোদিন ক্ষমতায় ছিলেন তার পুরোটাই ব্যয় হয়েছে পাকিস্তানে রাজনৈতিক দল বিকাশের পথকে চিরদিনের জন্য কন্টকিত করে দেবার হীন ষড়যন্ত্রে।

পাকিস্তান আমলের শুরু থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মওলানা ভাসনীর রাজনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করলে আমরা তাঁর কয়েকটি বিশাল অবদান চিহ্নিত করতে পারি যে গুলোর কোন একটির জন্যও তিনি স্মরনীয় হয়ে থাকতে পারেন।

১। মওলানা ভাসানী পাকিস্তানে প্রথম মুসলিম লীগের বিরোধিতা করে গনতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা করেন।

২। মওলানা ভাসানী পাকিস্তানে প্রথম অসাম্প্রায়িক রাজনীতির প্রবর্তন করেন।

৩। মওলানা ভাসানী প্রথম সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।

৪। মওলানা ভাসানীই প্রথম পূর্ব পাকিস্তানের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকারের কথা বলেন এবং স্বায়ত্বশাসনের দাবি উথাপন করেন।

৫। মওলানা ভাসানীই প্রথম শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষকে রাজনীতির মঞ্চে টেনে আনেন এবং মেহনতি মানুষের শ্রেনী শোষন থেকে মুক্তির কথা তুলে ধরেন।

৬। মওলানা ভাসানীই পাকিস্তানে প্রথম সমাজতন্ত্রকে ব্যাপক প্রচারে নিয়ে আসেন এবং জনপ্রিয় করে তোলেন।

ভাসানী সরকারে যাননি, চিন্তাও করেননি এমনকি বেশির ভাগ সময়ই তিনি রাজধানীর বাইরে গ্রামে থাকতেন। তাঁর জীবন ধারন ছিল একেবারে গরিব কৃষকের মত। তাঁর পরিবারের সদস্যদের জীবনমানও একই রকম ছিল। ভাসানী ছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

গরিব মানুষেরই একজন। আমাদের দেশের আর কোন নেতা সাধারন মানুষের এতো আপন হতে পারেনি। ভাসানী ছিলেন সবার থেকে স্বতন্ত্র ব্যতিক্রমধর্মী নেতা।

আওয়ামীলীগ গঠনে ভাসানীর ভূমিকাঃ

মওলানা ভাসানী আসাম থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দক্ষিন টাঙ্গাইল নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে পূর্ব বঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর অপর তিন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে ছিলেন করটিয়ার জমিদার খুররম খান পন্নী। পরাজিত খান পন্নীর এক আবেদনের ভিত্তিতে নির্বাচনী ক্রুটির কারনে গভর্নর নির্বাচন বাতিল বলে ঘোষনা করেন এবং ভাসানী পন্নীসহ চারজন প্রার্থীর ওপর ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কোন নির্বাচনে অংশগ্রহনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। সেই শূণ্য আসনে আবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৯এর ২৬ এপ্রিল এবার স্বয়ং খান পন্নী মুসলিম লীগের প্রার্থী মনোনীত হন এবং শুধু মাত্র সে কারনেই তাঁর ওপর থেকে বিশেষ ক্ষমতা বলে গভর্নর নির্বাচনে অংশ গ্রহনের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। অথচ ভাসানীসহ অন্যান্যদের নিষেধাজ্ঞা যথাপর্ব থেকেই যায়। সেই উপ-নির্বাচনে ওয়াকার্স ক্যাম্পের প্রার্থী শাসমুল হক বিপুল ভোটাধিক্যে মুসলিমলীগের প্রার্থীকে পরাজিত করেন। এই উপনির্বাচনই মুসলিম লীগের ভাঙ্গন তরান্বিত করে, সাধারন কর্মীরাও দলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। ইতোমধ্যে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মানকী শরীফের পীর, যিনি পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন, মুসলিম লীগ পরিত্যাগ করে 'আওয়ামীলীগ' নামক একটি বিরোধী দল গঠন করে। সোহরাওয়ার্দী করাচীতে গঠন করেন "জিন্নাহ আওয়ামী লীগ"

মুসলিম প্রার্থী পরাজিত হবার পর সরকার এবারও জঘন্য পন্থায় নির্বাচন বানচাল করার ষড়যন্ত্র করে। শামসুল হকের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয় এবং মামলা পরিচালনা করবার জন্য গঠিত বিশেষ ট্রাইবুনাল মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত পরিষদে তাঁকে আসন গ্রহন করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

"নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর এই মর্মে তারা শামসুল হকের নির্বাচন বাতিলের আবেদন করেন যে, নির্বাচনে তিনি ভাসানীর স্বাক্ষর জালকরে জয় লাভের উদ্দেশ্যে অসৎ পন্থা অবলম্বন করেছেন।"[১]

শুধু নির্বাচনী মামলাই নয় শামসুল হকের উপর সরকারী ও বেসরকারীভাবে নানারকম হয়রানী করা হয়। একজন নিরাপরাধের উপর ক্ষমতাসীনদের এ জাতীয় নির্যাতন ও অন্যায় আচরনে মুসলিম লীগের সাধারন কর্মীরা পর্যন্ত দলের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে।

ভাসানী ধুবড়ী থেকে এসে সিদ্ধান্ত নেন যে, আনুষ্ঠানিকভাবেই মুসলিম লীগ ত্যাগ করবেন। তিনি সারা দেশ ঘুরে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করেন এবং তাঁর অনুসারীদের এক কর্মী সম্মেলন করার তাগিদ দেন।

১৫ জুন ১৯৪৯ এক বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী ২৩-২৪ জুন মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন সফল করার আহবান জানান। তিনি বলেনঃ

"মুসলিম লীগ পূর্বের ন্যায় আর গণপ্রতিষ্ঠান নেই বলে পূর্ব-পাক সরকারের দ্বারা কোন জনকল্যাণমূলক কাজও করতে পারেনি। পূর্ব পাক লীগ নেতাদের অযোগ্যতার দরুনই আজ দেশে নানা রকম দুর্নীতি ও বিশৃংখলা দানা বেধেঁছে ও পাকিস্তান দিন দিন ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনায় এবং স্বার্থবাজদের কবল থেকে কওমী প্রতিষ্ঠান উদ্ধারের উপায় নির্ধারনের উদ্দেশ্যে পূর্ব পাক মুসলিম লীগ কর্মীসম্মেলন আহবান করা হয়েছে।" [২]

২৩ জুনের সম্মেলনে শেরে বাংলা ফজলুল হকও কিছুক্ষনের জন্য উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি কর্মীদের উদ্দেশ্য অতি সংক্ষিপ্ত এক ভাষণও দিয়েছিলেন। তখন তিনি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের এডভোকেট জেনারেল। সারা দেশ থেকে শ'তিনেক প্রতিনিধি সে সম্মেলনে যোগদান করেন। এই দিনই গঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ'। পূর্ববংগের প্রথম বিরোধী দল।

১) পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতিঃ বদরউদ্দিন উমর,১৯৭০ পৃষ্ঠা - ২৩২
২) সাপ্তাহিক সৈনিক, ১৭ জুন, ১৯৯৪

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা ভাসানী সর্ব সম্মতিক্রমে নির্বচিত হলেন এ'দলের সভাপতি। তারপর সকলের সংগে পরামর্শ করে তিনি ৪০ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী পরিষদের নাম ঘোষণা করেন। সেখানে ছিলেন পাঁচজন সহ-সভাপতি।

আওয়ামী লীগের মূলনীতিতে বলা হয় মুসলিম লীগের সংগে এর নীতিগত ব্যবধান নেই বরং ইসলামের সত্যিকারের আদর্শের ভিত্তিতেই এই দল গঠিত হয়েছে। এ দলের জেহাদ স্বৈরাচারী ও শোষক মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে। সম্মেলনে যে প্রস্তাব নেয়া হয় তার মধ্যে ছিলঃ-

১। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদ ও লাঙ্গল যায় জমি তার নীতি।

২। প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠান।

৩। দেশের বৃহৎশিল্প জাতীয়করন ও সরকারী উদ্যোগে নতুন কলকারখানা ও শিল্প গড়ে তোলা।

৪। কুটির শিল্পের উন্নতি সাধন।

৫। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা।

৬। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে তোলা।

৭। পাটকে জাতীয়করন ও চাষীদের ন্যায্য মূল্য প্রদান করা।

৮। সরকারী অফিস আদালতে ব্যয় সংকোচন।

৯। ভারত থেকে আগতদের পূর্নবাসনের ব্যবস্থা করা।

১০। জনগনের কাজ করার অধিকার স্বীকার করা।

১১। মুসলিম লীগ মন্ত্রীদের কর্মকলাপের বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করা।

১২। কারারুদ্ধ ছাত্রনেতাদের মুক্তির ব্যবস্থা করা প্রভৃতি।

৪৭ উত্তর কালে পূর্ব বাংলার ব্যাপক খাদ্য সংকট দেখা দেওয়ার খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্যেও সরকারের কাছে দাবী জানানো হয়।

"সূচানালগ্নে আওয়ামী মুসলিম লীগের সমর্থক কোন পত্রিকা ছিল না বরং এই দলের বিরুদ্ধে লেখার পত্রিকাই ছিল বেশী। তাই মওলানা "ইত্তেফাক" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেন। পাকিস্তান শব্দের অর্থ "সত্যভাষী"। জুলাই মাসে ঢাকা বার

Dhaka University Institutional Repository

লাইব্রেরীতে এ ঘরোয়া সভায় পত্রিকা প্রকাশের কথা ঘোষণা করে তিনি উপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে আবেদন করেন সাধ্যমত চাঁদা দিতে। তৎক্ষনাৎ চারশ টাকার মত উঠে। ইত্তেফাক প্রকাশের প্রথম তহবিল। দেশের অন্যান্য জায়গা ঘুরেও তিনি চাঁদা আদায় করেন। সেই টাকায় "সাপ্তাহিক ইত্তেফাক" আত্মপ্রকাশ করে ১৫ আগষ্ট ১৯৪৯ সালে। পরবর্তীতে দৈনিক পত্রিকা করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। শুরুতে সম্পাদক ছিলেন মওলানা ভাসানী। কিছুকাল পর প্রকাশনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহন করেন ইয়ার মোহাম্মদ খাঁন। পরে এর সম্পাদক নিযুক্ত হন তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, ইত্তেফাক অবিলম্বে জনপ্রিয় পত্রিকায় পরিণত হয়"।[১]

আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের সংগে সংগে পাকিস্তানের বিশেষ করে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে সুচিত হয় এক নতুন অধ্যায়ের।

ভাষা আন্দোলনে মওলানা ভাসানীর ভূমিকাঃ

পাকিস্তান গণপরিষদের ১৯৪৯ সালে ৭ সেপ্টম্বর অনুষ্ঠিত সভায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংবিধান সংক্রান্ত 'মূলনীতির' প্রস্তাব প্রকাশ করা হয়। এই মূলনীতিতে বলা হয়,উর্দু হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। দুই কক্ষবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদ গঠিত হবে। নিম্নকক্ষের প্রতিনিধি জনসংখ্যার অনুপাতে হবে। উচ্চকক্ষ প্রত্যেক প্রদেশের সমসংখ্যক প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হবে, তবে উভয় কক্ষের সমান ক্ষমতা থাকবে।

মওলানা ভাসানী সরকার প্রস্তাবিত মূলনীতি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন তিনি জেলে তখন আওয়ামী মুসলিম লীগের উদ্যোগে এক জাতীয় মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই মহাসম্মেলনে সংবিধানের জন্য সরকারের প্রস্তাবিত মূলনীতি পরিবর্তে একটি বিকল্প মূলনীতি প্রস্তাব করা হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগের বিকল্প এই মূলনীতিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে একটি যুক্তরাষ্ট্র করা, বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করা, ইত্যাদি প্রস্তাবনা ছিলো।

১) সৈয়দ আবুল মকসুদ, 'মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী' ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ পৃষ্ঠা-৭৩

Dhaka University Institutional Repository

ভাসানী জেল থেকে বেরিয়ে ২৪ ডিসেম্বর আরমানিটোলা মাঠে আওয়ামী মুসলিম লীগের এক জনসভা আহবান করলেন। ঐ জনসভায় তিনি সরকারের বুর্জোয়া শাসন নীতি এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে দহরম মহরমের জন্য প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলী খানের তীব্র সমালোচনা করেন।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলী খান ১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর এক ষড়যন্ত্রে নিহত হন। এরপর খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারী খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকা আসেন। ২৭ জানুয়ারী পল্টন ময়দানের এক জনসভায় তিনি দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করলেন 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। তিনি ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীকে 'ভারতের চর' আখ্যা দিলেন।

পূর্ব বাংলার জনগণ খাজা নাজিমুদ্দিনের বক্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ৩০ জানুয়ারী আব্দুল মতিনের নেতৃত্বে 'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি' গঠন করে। তারা ৪ ফেব্রুয়ারী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা কর্মসূচী গ্রহণ করে। পরদিন ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে কাজী গোলাম মাহবুবকে আহবায়ক করে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। রাজনীতিবিদ ও ছাত্র প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত এই পরিষদে মওলানা ভাসানী ছিলেন সবচেয়ে বর্ষীয়ান নেতা। পরিষদ ৪ ফেব্রুয়ারী 'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি' আহুত কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন জানায়।

'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি' কর্তৃক আহুত ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা কর্মসূচী সফল হওয়ার পর ৬ ফেব্রুয়ারী মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' এর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে,

(ক) বাংলা ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম কর্মসূচী পালন করা হবে,

(খ) ২১ ফেব্রুয়ারী 'ভাষা দিবস' হিসাবে পালন করা হবে, এবং

(গ) ২১ ফেব্রুয়ারী বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে পূর্ব বাংলায় সর্বাত্মক হরতাল পালন করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী পূর্ব বাংলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভার বাজেট অধিবেশন বসার কথা ছিলো। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের নির্দেশে সরকার ২০ ফেব্রুয়ারী রাত থেকে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করলো। মওলানা ভাসানী ১৮ ফেব্রুয়ারী এক রাজনৈতিক সফরে ঢাকার বাইরে গিয়েছিলেন। তাঁর অনুপুস্থিতিতে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে পরদিন ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার প্রস্তাব ১১-৪ ভোটে নাকচ হয়ে যায়। পরদিন 'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি'র উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বটতলায় জমায়েত ও বিক্ষোভ করে এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার কর্মসূচী নেয়। বিক্ষোভ ক্রমশঃ শক্তিশালী হলে ছাত্ররা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগানে মুখরিত হয়ে দলে দলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। পুলিশ ছাত্রদেরকে গ্রেফতার করলো ও টিয়ার গ্যাম ছুঁড়তে শুরু করে দিলো অব্যাহত বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে বহু মানুষ নিহত ও আহত হয়। নিহতদের মধ্যে রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার, শফিউর ও অহিউল্লাহর নাম উল্লেখযোগ্য সন্ধ্যা নাগাদ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাতপাতালে আহতদের দেখতে আসা জনতার স্রোতে ঐদিন ১৪৪ ধারার আর চিহ্নমাত্র রইলো না।

মওলানা ভাসানী ২১ ফেব্রুয়ারী ঘটনার দিন ঢাকার বাইরে ছিলেন। পরদিন পত্রিকায় দেয়া বিবৃতিতে তিনি ২১ ফেব্রুয়ারীর ঘটনার হোতা নুরুল আমীন সরকারের আচরণের প্রতি তীব্র নিন্দা জানান। তিনি অবিলম্বে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার, হাইকোর্টের জজ এবং জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত বিশেষ কমিশনের মাধ্যমে ঘটনার তদন্ত ও অপরাধীদের প্রকাশ্য বিচার করার দাবী জানান। সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন, স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল জনগণের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির চেষ্টা হিসাবে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী, বাঙ্গালী- বিহারী প্রশ্নের অবতারণা করছে। তিনি বলেন, কেউ যদি এই ভুলপথে পা বাড়ায় তাহলে সবকিছু নষ্ট হয়ে যাবে। সকলেই এদেশের বাসিন্দা ও ভাই ভাই। সকলের স্মরণ রাখতে হবে যে এই সংগ্রাম জুলুমের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে মওলানা ভাসানীর ভূমিকা মূখ্য ছিলো না বলে অনেকে বলতে চান। অথচ তারা ভুলে যান মওলানা ভাসানী ১৯৩৭ সালে আসাম ব্যবস্থাপক সভায় প্রথম বাংলা ভাষায় কথা বলেন ও সেখানে সকলের মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার স্থাপন করেন। ১৯৪৮ সালের ১৭ মার্চ পূর্ব বাংলা আইন সভায় তিনিই প্রথম বাংলায় কথা বলার দাবী তোলেন ও বাংলায় বক্তৃতা দেন।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারীর ঘটনার পর মওলানা ভাসানীসহ ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত এবং সমর্থনকারী সকল রাজনৈতিক নেতা এবং প্রগতিশীল ব্যক্তিদের উপর গ্রেফতারী পরোয়ানা ও নিপীড়ন নেমে আসে। মওলানা ভাসানী কয়েকদিন আত্মগোপন করে ছিলেন। এরপর ১০ এপ্রিল তিনি জেলা প্রশাসকের দপ্তরে গিয়ে আত্মসমর্পণ করে। তাঁকে সরাসরি জেলে পাঠানো হয়।

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে ভাসানীর ভূমিকাঃ

পূর্ব বাংলার সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী ছিল অনেকদিনের, মোহাম্মাদ আলী সরকার ১৯৫৪র মার্চে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষাণা করে। নির্বাচন হওয়ার কথা ঘোষিত হওয়া মাত্রই ১৯৫৩ সনের ২৭ শে জুলাই এ.কে ফজলুল হক তাঁর বিলুপ্ত কৃষক প্রজা পার্টির লোকজনদের নিয়ে গঠন করেন পাকিস্তান কৃষক শ্রমিক পার্টি। উল্লেখ্য যে, অবিভক্ত বাংলার এককালীন প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক পাকিস্তান অর্জনের পর রাজনীতিতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন এবং নিষ্ঠার সংগে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের এডভোকেট জেনারেলের চাকুরী করেছিলেন। সেই চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে তিনি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার জন্য তড়িঘড়ি দল গঠন করেন। ইতোপূর্বে চৌধুরী মোহাম্মাদ আলীর নেতৃত্বে পাকিস্তানে গঠিত হয়েছিল 'নেজামে ইসলাম পার্টি' নামে দক্ষিন পন্থী সাম্প্রাদায়িক রাজনৈতিক সংগঠন।

১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বরে নির্বাচনে মুসলীম লীগকে প্রতিহত করার জন্য আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম পার্টি, গণতন্ত্রী দল এবং খেলাফতে রব্বানী পার্টির সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি বিরোধী দলীয় ঐক্যজোট যা 'যুক্তফ্রন্ট' নামে পরিচিত। এই যুক্তফ্রন্টের নেতা নির্বাচিত হন মওলানা ভাসানী,

Dhaka University Institutional Repository

ফজলুল হক এবং সোহরাওয়ার্দী। এই ঐক্যজোট প্রণয়ন করে তাদের ২১ দফার একটি নির্বাচনী ইস্তেহার যেটি এদেশের রাজনীতিতে একটি অবিস্মরনীয় দলিল।

উল্লেখ করা দরকার যে, বিভিন্ন বামপন্থী ও দক্ষিনপন্থী দলের সমন্বয়ে গঠিত হলেও যুক্তফ্রন্টের ভেতরে বামপন্থী ও কমিউনিষ্টদের প্রভাবই ছিলো সর্বাধিক। একুশ দফা প্রতিশ্রুতির মধ্যে ছিল-পূর্ব পাকিস্তানের জন্য লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন আদায় করা, বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা, বিনা ক্ষতিপূরনে জমিদারী ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্ধৃত্ত জমি বন্টন করা। পার্টি ব্যবসাকে জাতীয়করন করে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রনে আনা ও পাট চাষীকে পাটের ন্যায্য দাম প্রদানের ব্যবস্থা করা। কৃষির উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন করা, খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করে দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা করা, অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন ও শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার প্রবর্তন করা। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন সহ সকল কালাকানুন বিলোপ করা। প্রশাসনিক ব্যয় সর্বাত্মকভাবে কমানো প্রধানমন্ত্রীর বাসভন বর্ধমান হাউসকে প্রথম একটি ছাত্রাবাস এবং পরে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের গবেষনা প্রতিষ্ঠানরূপে গঠন করা, ২১ শে ফেব্রুয়ারীকে 'শহীদ দিবস১' ও সাধারন ছুটির দিন ঘোষণা করা, ২১ শে ফেব্রুয়ারীতে যারা শহীদ হয়েছেন তাঁদের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি শহীদ মিনার তৈরী সহ শহীদ পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দান করা, সকল নিরাপত্তা ও নিরোধমূলক আইন বাতিল করা, ও বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি দেয়া, প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, ও মুদ্রাব্যবস্থা কেন্দ্রের অধীনে রেখে অন্যান্য সকল বিষয় ইউনিট সরকারের অধীনে আনা এবং সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তান ও নৌবাহিনীর সদর দপ্তর পূর্ব-পাকিস্তানে স্থাপনের ব্যবস্থা করা। একুশ দফা প্রনয়নের পূর্বে বাংলার জনগনের দাবী দাওয়া ও আবেগ অনুভূতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছিল। যুক্তফ্রন্টের এই নির্বাচনী ইস্তেহার অবিলম্বে এদেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে

Dhaka University Institutional Repository

জনপ্রিয় হয়ে উঠে, পক্ষান্তরে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের কোন নির্বাচনী ওয়াদা ছিল না।

একজন রাজনৈতিক নেতার ভাষায় - মওলানা ভাসানীর বর্ণনাতীত ও অপরিসীম ত্যাগ ও কঠোর পরিশ্রমই আওয়ামী লীগকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান দখলে সক্ষম করে। অত্যাচারী জালেম মুসলীম লীগ সরকারের আমলে শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক সরকারী চাকুরী এডভোটেক জেনারেলের পদ গ্রহণ করেন। জনাব আতাউর রহমান খাঁন স্বীয় ওকালতি পেশায় অধিকাংশ সময়ই মগ্ন ও স্বীয় পরিবার পরিজনদের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত ছিলেন। ফলে সরকারী অত্যাচার, নির্যাতন, জেলজুলুম, আর্থিক কষ্টভোগ সব কিছুই সহ্য করতে হয় সর্বত্যাগী মওলানা ভাসানীকেই। মজলুম নেতার অন্যতম পার্শ্বচর ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারন সম্পাদক তরুন নেতা শামসুল হক ও যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৫২ সালে ঢাকা কারাগারে আটকাবস্থায় জনাব শামসুল হক মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে ও মানসিক ব্যধিগ্রস্থ অবস্থায় কারামুক্তি লাভ করেন। জনাব শামসুল হক ১৯৫২ সালে কারান্তরালে থাকা বিধায় যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৫৩ সালে সভাপতি মওলানা ভাসানীর অনুরোধক্রমে জনাব শামসুল হকের স্থলে শেখ মুজিবুর রহমানকে সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়"। [১]

ভাসানীর রাজনৈতিক জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এটা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি সব সময়ই তরুন, সুদক্ষ, পরিশ্রমী, প্রগতিশীল ও গনমুখী নেতৃত্বের স্বপক্ষে ছিলেন। মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ থেকে ন্যাপ, ন্যাপের বিভক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যালোচনা করলে এসত্য স্পষ্ট হয় যে, তিনি ক্রমাগত তরুন থেকে তরুনতর ও প্রগতিশীলদের সংগেই ছিলেন। এ'ভাবেই তিনি হয়েছেন এদেশের বহু রাজনৈতিক নেতার স্রষ্টা- জনক।

(১) অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫ পৃষ্ঠা ২৫১-২৫২

Dhaka University Institutional Repository

ফজলুল হক, ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী তিন জনই ছিলেন পূর্ব বাংলার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও জনপ্রিয় নেতা। এ ত্রয়ীর নেতৃত্বে গঠিত ঐক্য জোট যেমন বঞ্চিত জনগনের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণচাঞ্চল্যের ও আশার সৃষ্টি করে তেমনি এদের ঘোষিত ২১ দফা নির্বাচনী ইশতেহারে ধ্বনিত হয়েছিল তাদের প্রাণের কথাই। রাতারাতি যুক্তফ্রন্টের পেছনে সম্মিলিত হলো সমস্ত দেশের মানুষ। এই তিন নেতা বিশেষ করে ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী আহার নিদ্রা ত্যাগ করে তিনটি মাস পূর্ব বাংলার গ্রাম- গ্রামন্তরে ঘুরে স্বৈরাচারী মুসলিম লীগের শাসনাকালের কুৎসিত চিত্র জনগনের কাছে তুলে ধরেন এবং সেই সংগে ব্যাখ্যা করে তাঁদের একুশ দফা দাবীর তাৎপূর্য।

পরিস্থিতি মুসলিম লীগের অনুকূলে নয় দেখে সরকার বিরোধী দলের কর্মীদের নির্বিচারে গ্রেফতার করতে লাগলেন। দুমাসে চৌদ্দ হাজার যুক্তফ্রন্ট সমর্থক গ্রেফতার হন। মুসলিম লীগের পরাজয়ের আশংকা করে এক পর্বায়ে কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচন বানচালের জন্য ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়।

সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হলেও পৃথক সাম্প্রদায়ী নির্বাচন ব্যবস্থায় ৫৪-এ- নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৩১০ সদস্য বিশিষ্ট পরিষদে ২৩৭টি আসনে যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে এবং এর মধ্যে মাত্র নয়টিতে জয়লাভ করে মুসলিম লীগ। পাঁচটিতে অন্যান্য দল এবং ২২৩ টিতে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী জয়যুক্ত হন। ৭৩টি সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষিত আসনের জন্য পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস, তফশিলী ফেডারেশন প্রভৃতি দলের সমন্বয়ে একটি ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল।

শুরু থেকেই যুক্তফ্রন্টের শরিক দলের মধ্যে বিরোধ কখনো প্রচ্ছন্ন কখনো প্রকাশ্য অবস্থায় বিরাজ করছিল। মতাদর্শগত বিরোধ ছাড়াও মনোনয়নের সময় প্রার্থী বাছাই নিয়েও বড় তিনটি দলের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। কোন রকমের জোড়াতালি দিয়ে পরিস্থিতিকে সামাল দেয়া হয়। কিন্তু মন্ত্রীত্ব নিয়ে বিরোধ তুংগে উঠে।

Dhaka University Institutional Repository

২ এপ্রিল ঢাকা বার লাইব্রেরীতে নবনির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সদস্যদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয় ভাসানীর সভাপতিত্বে, সেখানে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ফজলুল হককে ফ্রন্টের সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু স্বার্থ নিয়ে, মন্ত্রীত্ব নিয়ে কোন্দল চরম আকার ধারন করে।

যা হোক শেষ পর্যন্ত আপোষরফা করে ফজলুল হক তাঁর মন্ত্রীসভা সম্প্রসারিত করলেন ১৫ মে। শেখ মুজিব ও মোহন মিয়া দু'জনেই মন্ত্রী হলেন। কিন্তু ঐদিনই কেন্দ্রের কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্ররোচনায় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে নাজেহাল করার মতলবে আদমজী পাটকলের বাঙ্গালী-অবাংগালী শ্রমিকদের মধ্যে এক ভয়াবহ দাংগা বাধিয়ে দেয়া হয়। তার আগে নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই ২৩ মার্চ কর্ণফুলী কাগজ কলের বাঙ্গালী অবাঙ্গালী শ্রমিকদের মধ্যেও এক সাম্প্রাদায়িক দাংগা বাধিয়ে দেয়া হয়। আদমজীতে অসংখ্য শ্রমিক নিহত হন।

পূর্ব বাংলার অমুসলিম সরকার গঠিত হওয়ার কেন্দ্রীয় শাসকচক্র অত্যন্ত বিচলিত ও মরিয়া হয়ে ওঠেন। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী প্রকাশ্যেই বলেন যে আওয়ামী লীগও কৃষকশ্রমিক পার্টি ভারতের অর্থপুষ্ট। তিনি যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভারত চীন রাশিয়ার দালাল সরকার বলে অভিহিত করেন। যুক্তফ্রন্টের উত্তাল জনপ্রিয়তার মুখে ফজলুল হক, ভাসানী, সোহরাওয়ার্দীর মতো দেশবরেন্য নেতারা যদি ভারতের সহযোগিতায় পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্যেগ নেন তা পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে প্রতিহত করা কঠিন হবে।

৩০ মে গভর্ণর জেনারেল কমিউনিষ্ট বিশৃংখলা দমনে ব্যর্থ হন মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করেন এবং ৯২-র 'ক' ধারা জারি করে পূর্ব বাংলার কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তন করা হয়। শুধু যে মন্ত্রীসভা বাতিল করা হয় তাই নয় মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হককে গৃহ বন্দী করা হয়, শেখ মুজিবসহ ত্রিশজন পরিষদ সদস্য হলেন গ্রেফতার। সভা-মিছিল নিষিদ্ধ করে সারা দেশে জারি করা হলো ১৪৪ ধারা গ্রেফতার করা হলো দেড় হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে।

Dhaka University Institutional Repository

শর্তকরা ৯৮ জন মানুষের রায় পেয়ে পূর্ব বাংলার নব-নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকে অবৈধভাবে বরখাস্ত করে কেন্দ্রের আধা সামারিক সরকার প্রতিষ্ঠায় শুধু যে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন পাকিস্তানীরাই মর্মাহত হয়েছিল তাই নয় বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক ও সমাজবাদী দেশের মানুষই অবাক হয়েছিল।

পূর্ববাংলার গর্ভণরের শাসন জারি ও সদ্য গঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিলের সংবাদ বেতারে শোনা মাত্র লন্ডনে অবস্থানকারী মওলানা ভাসানী উত্তেজনায় ফেটে পড়েন। পূর্ব বাংলার ব্যাপারে ভাসানীর সাক্ষাৎকার ও প্রতিক্রিয়ায় নেবার জন্য লন্ডনস্থ নানা দেশের সাংবাদিকরা তাঁর বাসভবনে যান। এতগুলো সাংবাদিককে একক ইন্টারভিউ দেওয়া সম্ভব নয়। মওলানা সাহেব তাদেরকে বলে দিলেন যে, তাঁর যা বলার আছে আগামীকালের সাংবাদিক সম্মেলনেই বলবেন। ভাসানীর দোভাষী তরুন সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ আলী নেতাকে পরিচয় করিয়ে দেন সাংবাদিকদের সংগে। ভাসানীর মূল ভাষনের আগেই ইংরেজীতে অনুবাদ করে সাংবাদিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়ঃ

মওলানা সাহেব তাঁর ভাবনে পাকিস্তানের সংক্ষিপ্ত এক ইতিহাস প্রদান করেন। তাতে ছিল মুসলিম লীগ শাসনের সাত বছরের ইতিহাস, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও নয়া রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচনায় তাদের ব্যর্থতা, রাষ্ট্রীয় জীবনে সর্বত্মকভাবে চন্ডননীতি ও দুর্নীতির প্রভাব রাষ্ট্র ভাষা ও অর্থনৈতিক প্রশ্নে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারনের মধ্যে মিথ্যা ও দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারনা, পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে হিংসা-দ্বেষ সৃষ্টি, পাকিস্তানের মূল প্রস্তাবানুযায়ী প্রত্যেকটি প্রদেশের স্বায়ত্ত্বশাসন দাবির প্রতি সন্দেহ ও অশ্রদ্ধা প্রকাশে শাসকচক্রের সক্রিয় ভূমিকা।

সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেনঃ "পাকিস্তান সম্পর্কে জনতার মনে যে আস্থা ও উচ্চাশার সৃষ্টি হয়, ভ্রান্তনীতি ও দলীয় উপদলীয় কোন্দলে গনমনের সে আশা আকাংখা মাত্র সাত বছরের মধ্যে পরিবর্তিত হয় হতাশায়। জনগনের সেই মানসিক প্রতিক্রিয়ার সুযোগ গ্রহণ করলেন মুসলিম লীগ সমর্থিত স্বার্থ শিকারীর দল।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতার নামে ধনী হল আরও ধনী। টাকায় তারা গেলো ফেঁপে। এদিকে দরিদ্র জনসাধারন হলেন দরিদ্রতর। দেশবাসীর ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি না খেললে আপনারা কোথায় দেখেছেন যে আজাদী লাভের পর মানুষ এত দুর্দশাগ্রস্ত হয়"[১]

প্রায় তিন ঘন্টা ব্যাপী সাংবাদিক সম্মেলনে ভাসানী তৎকালীন ষড়যন্ত্রের রাজনীতির মুখোশ উন্মোচন করে এবং সেই সংগে তিনি পাকিস্তানের ঐতিহাসিক পটভূমিও ব্যাখ্যা করেন। এদিকে দেশে এতবড় অবিচার ঘটিত হওয়ার পরও সরকার কোন প্রকার প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি।

মওলানা ভাসানীর ইউরোপে গমনঃ-

খোন্দকার ইলিয়াসের "ভাসানী যখন ইউরোপে" গ্রন্থের ভূমিকায় ভাসানী স্বয়ং লিখেছেন, ১৯৫৪ সালের প্রথম দিকে সাধারন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানে যে, অভূতপূর্ব গণজাগরনের সৃষ্টি হয়, তাহার স্মৃতি মনের কোনে মিলাইয়া যাইতে না যাইতে আরেকটি আকস্মিক ঘটনা আমার জীবনে ঘটিয়া গেল। সেটি আমার ইউরোপ সফর।

বিশ্ববিখ্যাত ফরাসি বৈজ্ঞানিক জুলিওকুরী বিশ্ব শান্তি পরিষদের সভাপতিরূপে আমাকে এক দাওয়াতপত্র পাঠাইলেন জার্মানীর রাজধানী বার্লিনে শান্তি পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে যোগদান করার জন্য। "কাজেই বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগদানই ছিল আমার ইউরোপ সফরের মূখ্য উদ্দেশ্য"।

খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াশের ভাবায় "ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি অংসখ্য সভাসমিতিতে ভাষণ দিয়েছেনঃ সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছেন, রাজনৈতিক নেতা, শ্রমিক নেতা, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবিকে সাক্ষাৎদান করেছেন। তিনি বৃটিশ শ্রমিক দলের গুরুত্বপূর্ণ দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে বিশেষ অতিথীর সম্মান লাভ করেছেন, যোগদান করেছেন ষ্টকহমে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তি সম্মেলনের সভাপতিমন্ডলীর সদস্যরূপে"[২]।

(১) খন্দকার মোঃ ইলিয়াস-ভাসানী যখন ইউরোপে, ঢাকা মুক্তধারা, ১৯৮৭ পৃষ্ঠা ১৩৬

(২) খন্দকার মোঃ ইলিয়াস-ভাসানী যখন ইউরোপে, ঢাকা মুক্তধারা, ১৯৮৭ পৃষ্ঠা ১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

লন্ডন থেকে স্কটল্যান্ড আর স্কটল্যান্ড থেকে রোম। সর্বত্র সাংবাদিক ছাত্র শ্রমিক মধ্যবিত্ত ঘিরে ধরলেন তাদের মিষ্টার মওলানাকে। ভাসানী বললেন- আমরা সকল দেশের সকল মানুষের বন্ধুত্বকারী। যুদ্ধ আর ধ্বংস আমাদের কাম্য নয় আমরা চাই শান্তি আর সৃষ্টি। এই হচ্ছে আমার ইসলামের মূল শিক্ষা। এই হচ্ছে পাকিস্তানবাসীর জীবনদর্শনের প্রাণ কথা। নিপীড়িত মানুষের পক্ষে পাকিস্তানের কোন জননেতা এমন দৃঢ় আওয়াজ এর আগে কখনও তোলেননি। দুনিয়ার মানুষ শোনেনি কখনো।

মওলানা ভাসানীর মূল গন্তব্য ছিলো জার্মানীর বার্লিনে, উদ্দেশ্য বিশ্ব শান্তি পরিষদের মহাসম্মেলনে যোগদান। কিন্তু তিনি যখন করাচী থেকে বিমানে উঠেন, তাঁর ছায়া অনুসরণ করতে থাকে প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর ভাড়া করা দু'জন আমেরিকার আর্ন্তজাতিক গোয়েন্দা বিভাগের গুপ্তচর। করাচী থেকে বসরা, বসরা থেকে নিকোশিয়া যেখানে ভাসানীর যাত্রা বিরতি ঘটেছে সর্বত্রই গুপ্তচর দুজন তাকে অনুসরন করেছে।

তাড়াহুড়া করে যাত্রার কারণে করাচী থেকে মওলানা ভাসানী ও তাঁর অন্য সঙ্গীরা পশ্চিম জার্মানীর ভিসা সংগ্রহ করতে পারেননি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আমেরিকা ঘেঁষা পাকিস্তান সরকারের গোপন নির্দেশে জার্মান দূতাবাস সুপরিকল্পিতভাবে মওলানা ভাসানীর ভিসা দিতে বিলম্ব করায় তিনি শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে পারলেন না। সম্মেলনে যোগদানের ব্যর্থতার কথা জানিয়ে ভাসানী বার্লিনে একটি বাণী পাঠিয়ে দেন। সম্মেলনের মূল সভাপতি ফ্রেডরিশ জুলিও কুরী ভাসানীর বাণীটি শেষ অধিবেশনে পড়ে শোনাল। ভাসানীকে সম্মেলনের অন্যতম সভাপতি নির্বাচিত করা হয়েছিল।

"কি কারণে বিশ্ব শান্তি পরিষদের সম্মেলনে পাকিস্তানী প্রতিনিধিদল যোগদান করতে পারলেন না, সভাপতি তাঁর এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। তারপর তুমুল করতালির মধ্যে ভাসানীর বাণীটি পড়ে শুনান হয়। তাতে বলা পাকিস্তানবাসীদের জীবনদর্শনের মূল কথা শান্তি। মানুষে মানুষে, জাতিতে-জাতিতে সৌভ্রাতৃত্ব ও সহনশীলতা বিশ্বশান্তির গ্যারান্টি"[১]।

(১) খন্দকার মোঃ ইলিয়াস-ভাসানী যখন ইউরোপে, ঢাকা মুক্তধারা, ১৯৮৭ পৃষ্ঠা ২৭৯

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীর বুকে আরেকটি মহাযুদ্ধের সম্ভবনা নির্মূল করার লক্ষ্যে আর বিশ্বব্যাপী যে জনমত সৃষ্টি হয়েছে পাকিস্তানবাসীরা তার জন্য দৃঢ় আস্থা ও গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে বিশ্ব শান্তি পরিষদের উপর। যুদ্ধবিরোধী জনমত গঠনে রয়েছে শান্তি আন্দোলনের অগ্রদূতদের সকলের একান্তিক প্রচেষ্টা। যুদ্ধবাজদের অনিবার্য পতন ও ধ্বংস কামনা করে আমরা পাকিস্তানবাসীরা আপনাদের কন্ঠের সংগে মিলিয়ে আওয়াজ তুলেছি, বিশ্বশান্তি জিন্দাবাদ"।

এর মধ্যে ৫৪ সালের শেষ দিকে জুরিখ হাসপাতাল থেকে সোহরাওয়ার্দী যান লন্ডনে। ভাসানী সোহরাওয়ার্দী সাক্ষাৎকার হয় এবং দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে তাঁদের মধ্যে মত বিনিময় হয়। অবশ্য সোহরাওয়ার্দী সম্পর্কে ভাসানীর একটি মন্তব্য অনুধাবনযোগ্যঃ দেশবাসী যদি সহরাওয়ার্দীকে পরিচালনা করেন তবে তাকে দিয়ে মঙ্গল সাধন একরূপ নিশ্চিত। কিন্তু সোহরাওয়অর্দী যদি দেশবাসীকে পরিচালনার নিরংকুশ ক্ষমতা লাভ করেন, তবে তখন দেশের মঙ্গল ও অমঙ্গলের সম্ভবনা ও আকাংখা দুই থাকে প্রবল।

পাকিস্তান তখন গোলাম মোহাম্মদ আর মোহাম্মদ আলীর ক্ষমতার লড়াই জমে উঠেছে। জুরিখ লন্ডন থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করে সোহাওয়ার্দী বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রীসভায় আইনমন্ত্রী হয়ে গেলেন। অথচ এই মোহাম্মদ আলী একদিন ছিলেন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী। সোহরাওয়ার্দী এই আপোষকামিতায় ক্ষুব্ধ ছিলেন ভাসানী যা শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে তীব্র বিরোধে পর্যবসিত হয়। পাকিস্তানের রাজনীতিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক শক্তিরূপে থাকে সোহরাওয়ার্দী আর তার বিপরীতে থেকে যান অবহেলিত জনসাধারনের পাশে ভাসানী।

সারা জীবনের পোষাক লুঙ্গি-পাঞ্জাবি, টুপি পরেই প্রাচ্যের মনীষী ভাসানী পাশ্চাত্যের শহর গুলোয় কয়েকটি মাস কর্মব্যস্ত অবস্থায় কাটান। এতো স্বেচ্ছায় অবস্থান নয় নির্বাসন, নির্বাসিত জীবনের গ্লানিকেও তিনি কাজের মাধ্যমে মূল্যবান করে তুললেন। তাঁর মতো একজন বরেন্য নেতার জীবন সর্ব অবস্থায় অকল্পনীয় সাদাসিধে ছিলোঃ

Dhaka University Institutional Repository

"লাগেজ বলতে মওলানা ভাসানীর আজীবন সাথী একটি মাত্র স্যুটকেস, দৈর্ঘ্য ষোল ইঞ্চি, সম্পদ বলতে তার মধ্যে তাকে একটি গামছা একটি লুঙ্গি একটি খদ্দরের পাঞ্জাবি, মাথার একটি তালের টুপি, এ নিয়েই তিনি পূর্ব বাংলার শহরে গ্রামে সফর করেন এবং এ নিয়েই তিনি গেছেন ইউরোপ সফরে"[১]।

সুইডেনে শান্তি সম্মেলনে ভাসানীর ভূমিকাঃ-

মওলানা ভাসানী লন্ডনে অবস্থানকালে প্যারিস থেকে জুলিও কুরীর দ্বিতীয় আমন্ত্রন পান ১৯৫৪র নভেম্বরে ষ্টকহোম-এ অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনের এক বিশেষ অধিবেশনে যোগদানের জন্য। বার্লিনে শান্তি অধিবেশনে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেননি বলেই ষ্টকহোমে তাঁকে বিশেষভাবে আমন্ত্রন জানানো হয়। বার্লিনের মতো এবারও তিনি সম্মেলনের সভাপতি মন্ডলীর একজন নির্বাচিত হন।

"এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী উত্তর কোরিয়ার ইল সং, ভিয়েতনাম শান্তি আন্দোলনের অগ্রদূত ডাক্তার নিয়েম ডিং জাপান, নাইজেরিয়া, সিংহল, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মিশর, জার্মানী ও ইতালির প্রতিনিধিদলের নেতারা মওলানা ভাসানীকে জানালেন তাঁদের শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন"।[২]

সম্মেলনে মওলানা ভাসানী তাঁর বক্তৃতা বাংলায় পাঠ করলেন। ভাসানীর ডিকটেশন মতো ভাষনটি রচনা করে খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াশ এবং সম্মেলনের জন্য সেটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন সাংবাদিক এস.এস আলী। ভাসানী বলেনঃ "বন্ধুগন, বিগত দেড় শ বছর সুইডেনের মহান অধিবাসীগন যুদ্ধ থেকে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত রাখতে পেরেছেন। আজ সেই দেশের মাটিতে বিশ্বাশান্তি সম্মেলনে বক্তৃতা করার সৌভাগ্য হওয়ার আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। আমি শান্তিকামী পাকিস্তানীদের পক্ষ থেকে সুইডেন ও তাঁর অধিবাসীদের জন্য বহন করে এনেছি মৈত্রী, সৌভ্রাতৃত্ব ও শান্তির বাণী।

(১) খন্দকার মোঃ ইলিয়াস-ভাসানী যখন ইউরোপে, ঢাকা মুক্তধারা, ১৯৮৭ পৃষ্ঠা ২৭৯

(২) খন্দকার মোঃ ইলিয়াস-ভাসানী যখন ইউরোপে, ঢাকা মুক্তধারা, ১৯৮৭ পৃষ্ঠা ২৭৯

Dhaka University Institutional Repository

"বন্ধুগন আজ থেকে সাত বছর আগে ১৯৪৮ সালে এই ষ্টকহোম শহর থেকেই সর্বপ্রথম উত্থিত হয় শান্তির আওয়াজ। ষ্টকহোম আবেদন নামে খ্যাত শান্তির আবেদনে স্বাক্ষর দান ও স্বাক্ষর সংগ্রহে সেদিন যারা উদ্যোগ হয়েছিলেন আমি তাঁদের সকলকে জানাই শ্রদ্ধা। আমি শ্রদ্ধা জানাই সেই মহান বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনকে যিনি আমরণ সংগ্রাম করেছেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে। আমি অভিনন্দন জানাই বিশ্বসাহিত্যক জর্জ বানার্ড শ-কে যিনি ছিলেন বিশ্বশান্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। আমি শ্রদ্ধা জানাই বৈজ্ঞানিক জুলিও কুরীকে যার জীবনের একমাত্র সাধনা মানবতাকে হানাহানি ও রক্তারক্তি থেকে মুক্তি দিয়ে পৃথিবীর বুকে শাশ্বত শান্তির নির্মল পরিবেশ সৃষ্টি করা। আমি শ্রদ্ধা জানাই সোভিয়েত ইউনিয়নের কালজয়ী উপন্যাসিক ইলিয়াশ ইরেনবুর্গকে তাঁর অমর লেখনী আজ নিয়োজিত মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধ ও চিরস্থায়ী মৈত্রী স্থাপনের কাজে।"[১]

দুনিয়ার মানুষের হে মহান সাহাবাগন, তোমরা পাকিস্তানবাসীর আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করো। একমাত্র বিশ্বশান্তিই দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে দেশ গঠনের গ্যারান্টি। একারেণ আমাদের দেশ পাকিস্তান শান্তি ব্যতীত অন্য কিছু চিন্তাও করতে পারে না। পাকিস্তানবাসীর সেই শান্তির কামনাই আজ শোনাতে এসেছি বিশ্বের দরবারে।

শান্তি সম্মেলন উপলক্ষে মওলানা ভাসানী সুইডেন বাদে ও নরওয়ে ও ডেনমার্ক সফর করেন। ইস্কান্দার মীর্জার প্রকাশ্য হুমকির পরে ভাসানী দেশে ফেরার ব্যাপারটি কিছুদিনের জন্য পিছিয়ে গেল। সোহরাওয়ার্দী জুরিখে চিকিৎসার পর সেখানেই স্বাস্থ্যোদ্ধার করছিলেন। এদিকে দেশে ক্ষমতাচ্যুত যুক্তফ্রন্ট নেতারা পুনরায় ক্ষমতায় অংশ গ্রহণ করার জন্য কেন্দ্রীয় নেতাদের সংগে গোপনে আতাত করে চলছিলেন। জুরিখ লন্ডন থেকে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সোহরাওয়ার্দী ভাসানীর ফোনে ও চিঠিতে যোগাযোগ অব্যাহত ছিল।

(১) খন্দকার মোঃ ইলিয়াস-ভাসানী যখন ইউরোপে, ঢাকা মুক্তধারা, ১৯৮৭

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলার ৯২-ক ধারা জারি করেই শান্ত হলো না এ অঞ্চলের জনতার ঐক্যকে নষ্ট করার জন্য নানান চক্রান্তে লিপ্ত হলো এবং তারা এখানকার লোকদের দ্বারাই বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস চালান। খোন্দকার ইলিয়াস পরিহাস করে লিখেছেন, "পূর্ব-বাংলার ঐক্য হলো দ্বি-খণ্ডিত। ক্ষমতার গন্ধ পেয়ে যুক্তফ্রন্টের ফজলূল হকের দল জনসাধারনের প্রতি প্রদত্ত একুশ দফার সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে ভিড়ে গেলেন মোহাম্মদ আলীর সংগে। এদিকে যুক্তফন্টের অপর দল আওয়ামী লীগ ভিড়লেন গোলাম মোহাম্মদের তরীতে। অবস্থা চরমে উঠলো গোলাম মোহাম্মদের পূর্ব বাংলা সফর নিয়ে। যুক্তফ্রন্টের দুই দলের তীব্র প্রতিযোগিতা গোলাম মোহাম্মদের গলায় কে আগে মালা পরাবেন। গলা গোলাম মোহাম্মদের একটি। একটি মালা শোভা পাচ্ছে শেরে বাংলা ফজলুল হকের হাতে আর একটি মালা আতাউর রহমানের হাতে। অবশেষে উপায়ন্তর না দেখে তিনি বললেনঃ দুই রাধা এক হও। দুই মালা এক করো। চার হাতেরই দুই মালা এক করে পরাও এক গলায়। পরিস্থিতিটি ন্যাক্কারজনক। পূর্ব-বাংলারই মাথা হেট হলো বিশ্বের চোখে"।[১] যে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ গণপরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে অসুবিধায় পড়ে ছিলেন সেই ব্যক্তিকে বরণ করা নিয়ে পূর্ব বাংলার নেতৃবৃন্দের প্রতিযোগিতা শুধু দুঃখজনকই নয় হাস্যসম্পদ ও বটে।

ভাসানীর দেশে প্রত্যাবর্তন ও অনশনঃ-

মওলানা ভাসানী যখন লন্ডন তখন পাকিস্তান অতিবাহিত করেছিল তার রাজনৈতিক জীবনের বিশেষ সংকটের কাল। তখন পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকবর্গের পূর্ববাংলা বিদ্বেষ চরমে পৌঁছেছে, পূর্ব বাংলার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাই শুধু বাতিল করা হয়নি ৯২-ক ধারায় কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে শত শত প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক কর্মীকে। ও দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন্দল, ক্ষমতার লড়াই, এসব খবর লন্ডনে বসে পাচ্ছিলেন আর রাগে ঘৃনায় জর্জরিত হচ্ছিলেন ভাসানী।

(১) খন্দকার মোঃ ইলিয়াস-ভাসানী যখন ইউরোপে, ঢাকা মুক্তধারা, ১৯৮৭ পৃষ্ঠা ২৪৪

Dhaka University Institutional Repository

এ দিকে "দেশে ফেরামাত্র তাকে গুলি করে হত্যা করা হবে" বলে ঢাকা বিমান বন্দরে গভর্নর ইস্কান্দার মীর্জার প্রকাশ্য বিবৃতি, তাই ভাসানীর আরও কিছুদিন লন্ডনে থাকা বাঞ্চনীয় বলে তার শুভানুধ্যারীরা মত প্রকাশ করেন এবং তাকে বাধ্য করেন, যদিও তিনি নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য উদগ্রীব ছিলেন। পূর্ব বাংলায় একের পর এক সরকার গঠিত হল কিন্তু ভাসানীকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কারো তেমন কোন উদ্যোগ নিতে দেখা গেল না। তাছাড়া সোহরাওয়ার্দী তাঁকে বলে এসেছিলেন যে, তাঁর আহবান না পাওয়া পর্যন্ত ভাসানী যেন দেশে ফেরার ঝুঁকি না নেন। সেই কথা মত তিনি লন্ডন থেকে প্যারিস ও বোম্বে হয়ে কলকাতায় এসে এক হোটেলে অবস্থান করছিলেন। অবশেষে জনসাধারন ও আওয়ামী লীগের অব্যাহত দাবীর মুখে আইনমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী নিজেই কলকাতা গিয়ে তার বিমানে করে ১৯৫৫ সালের ১৫ এপ্রিল ভাসানীকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। উল্লেখযোগ্য যে, সোহরাওয়ার্দীর চেষ্টায় ভাসানীর দেশে প্রত্যাবর্তনের ওপর আরোপিত সরকারী বিধিনিষেধ নেয়া হয়।

ঢাকা ফিরেই ভাসানী সোহরাওয়ার্দীর ওপর চাপ দিলেন যে, অবিলম্বে বিনা বিচারে আটক বামপন্থী ও কমিউনিষ্ট কর্মী ও নেতাদের মুক্তি দিতে হবে এবং সকল রাজনৈতিক কর্মীর উপর থেকে হুলিয়া প্রত্যাহার করতে হবে। এ বিষয়ে অবিলম্বে ব্যবস্থা গৃহীত না হলে তিনি সরকারের বিরুদ্ধে উত্তাল গনআন্দোলন শুরু করবেন। ভাসানী এবং সোহরাওয়ার্দী পরস্পরকে ভালো চিনতেন এবং পরস্পরের প্রতি ছিলো তাদের শ্রদ্ধাবোধ। তাই ভাসানীর দাবীর প্রেক্ষিতে সোহরাওয়ার্দী বলেছিলেনঃ "রাজবন্দীদের মুক্তির চেষ্টা আমি করছি। কিন্তু কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে হুলিয়া বাতিল করা সম্ভব নয় কারণ কেন্দ্রীয় সরকার রাজী হবেন না এ জন্য যে, যুক্তরাষ্ট্রের সংগে মিলিটারী প্যাক্টের মধ্যে এমনি একটা শর্ত আছে বলে আমি শুনেছি যদিও আমি এখনও সে প্যাক্ট এর শর্তাবলী স্বচক্ষে দেখিনি। সোহারাওয়ার্দীর এই স্বীকারোক্তিতে স্বভাবই ক্ষব্ধ হয়েছিলেন ভাসানী সোহরাওয়ার্দীর এই সময়কার ভূমিকাকে ভাসানী স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারেনি"[১]।

(১) বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনীঃ কামরুদ্দিন আহম্মেদ, ঢাকা, ১৯৭৯ পৃষ্ঠা - ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধান কনভেনশনের পরিবর্তে গর্ভণর জেনারেল ১৯৫৫-এর ২৮ মে ৮০ সদস্য বিশিষ্ট একটি গণ-পরিষদ গঠনের আদেশ জারি করেন। উল্লেখযোগ্য যে, আওয়ামী লীগ ছিল পরিষদের সংখ্যালঘু দল। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনের দাবী পূরণ হয়নি, তবে উর্দুর সংগে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হয়। কিন্তু যেহেতু শাসনতন্ত্র প্রণয়নে তাঁর নিজের ভূমিকা ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই সোহারাওয়ার্দী ১৯৫৭এর ১৪ জুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পল্টন ময়দানের এক জনসভায় অবলীলায় বলে ছিলেন যে, সেই শাসনতন্ত্রে পূর্ব-পাকিস্তানের ৯৮ ভাগ স্বায়ত্বশাসন আদায় করা হয়েছে। ভাসানী এই উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন এবং পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের জন্য জোর আন্দোলন ও জনমত গঠনের জন্য দেশব্যাপী জনসভা করে বেড়াচ্ছিলেন।

পূর্ব পাকিস্তানে তখন খাদ্যসংকট বিরাজ করছিল, যাকে প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থাই বলা চলে। প্রধানমন্ত্রী হয়েই তার পরদিন সোহরাওয়ার্দী ঢাকা আসেন এবং ঐদিনই পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয় ভাসানীর সভাপতিত্বে। পূর্ব পাকিস্তানে তখন আতাউর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় ছিলো। একদিকে রাজপথে বুভুক্ষ জনতার মিছিল অন্যদিকে আওয়ামী লীগের নেতারা মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে বিলাস বহুল জীবনে গা এলিয়ে দিয়েছেন, এই অবস্থাটা চির বিদ্রোহী ভাসানী কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই পল্টনের জনসভায় সোহরাওয়ার্দীর উপস্থিতে যখন সকল আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ মুখর তখন সভাপতির ভাষণ দান কালে ভাসানী তাঁকে কিছুটা বেফাঁস ভাষায় আক্রমন করেন। ক্ষুধার্ত জনতার দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ও অসংযমী হয়ে পড়েন মজলুম জননেতা। তিনি এমন কথাও বলে যে, যদি প্রধানমন্ত্রী খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হন তবে তাকে জনতার সামনেই বেত্রাঘাত করা হবে এবং দুই সপ্তাহের মধ্যে যদি নয়টি জেলায় নয় হাজার মন খাদ্য পাঠাতে না পারে তবে তোমার ঐ প্রধানমন্ত্রীর গদিতে আমি পদাঘাত করি। ভাসানীর ক্ষুব্ধ ভাষণে সোহরাওয়ার্দী

Dhaka University Institutional Repository

সাংঘাতিক বিব্রত ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সন্দেহ নেই কিন্তু তিনি তার প্রতিবাদও করেন নি বা ভাসানীর প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে তাঁকে জব্দও করেন নি। কিন্তু ভাসানীর

ভাবনের প্রতিশোধ নিয়ে ছিলেন তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ইত্তেফাকের মাধ্যমে'। তখন থেকে আমৃত্যু তিনি তার বিরুদ্ধাচরণ করে গেছেন।
উল্লেখ্য যে, সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হবার অব্যবহিত আগে ঢাকার রাজপথে এক ভূখা মিছিলে বিনা প্ররোচনায় পুলিশ গুলি চালালে অন্ততঃ তিন ব্যক্তি নিহত হয় এবং আহত হয় সংখ্যাহীন।

১৯৫৬ সালের গ্রীষ্মকালে ভাসানী বাংলাদেশের কয়েকটি জেলা সফর করে এসে ঢাকায় ঘোষনা করলেন যে, দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। অবিলম্বে মফস্বলে খাদ্য সরবরাহ না করলে লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে মারা যাবে, কিন্তু সরকার তার কথায় কর্ণপাত না করায় নেতাদের টনক নড়ানোর জন্য তিনি ঘোষনা করলেন যে দেশে খাদ্য সমস্যার সমাধান না করলে তিনি আমরণ অনশন ধর্মঘট করবেন। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য কেন্দ্র থেকে পর্যাপ্ত অর্থ মঞ্জুর না করা পর্যন্ত তিনি অনশন চালিয়ে যাবেন বলেও ঘোষণা করেন। ৭ মে ১৯৫৬ সালে তিনি অনশন শুরু করেন। অনশনের চারদিন পর তার স্বাস্থ্যের অবনতি দেখা দেওয়ার তাকে শেখ মুজিব সহ অন্যান্যরা ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালে নিয়ে যান। শুধু দুর্ভিক্ষ রোধ নয় তার অন্য দাবীগুলোর মধ্যে ছিলো অবিলম্বে বিদেশ থেকে চাল আমদানী করা এবং পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র থেকে অধিক অর্থ বরাদ্দ। অনশন ব্রত শুরু করার সংগে সংগে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী বসন্তকুমার দাস এক চিঠিতে ভাসানীকে অনশন প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান।

এদিকে ক্ষমতার লড়াইয়ে পূর্ব বাংলার বাঘা বাঘা চক্রান্তকারী নেতারাও হেরে গেলেন। রাজনীতিকদের মধ্যে হানাহানি ও পারস্পারিক বিদ্বেষ ক্রমাগত বেড়েই চলল। সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রীত্ব হারালেন। ইস্কান্দার আইয়ুব ষড়যন্ত্র সাফল্যের

Dhaka University Institutional Repository

দিকে এগোতে লাগলো এবং এক বছর ১৯৫৭ এর ৭ অক্টোবর সারা দেশে জারী হলো সামরিক আইন।

ভাসানীর ১৯৫৫ সালের ঐতিহাসিক ভাষণঃ

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে ১৯৫৫ সালের ২১-২৩ অক্টোবর পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের তিনদিন ব্যাপী দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার রূপমহল সিনেমাহলে। ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে প্রদেশের শত শত কর্মী ও প্রতিনিধি যোগদান করেন। পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলের ইতিহাসে এই সম্মেলনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এতে দলের বাম ও দক্ষিনপন্থীদের বিরোধ স্পষ্টরূপে ধরা পড়লেও শেষ পর্যন্ত বামপন্থীদের প্রভাবই কোনমতে অক্ষুন্ন থাকে। এই অধিবেশনের এক প্রস্তাবে বলা হয়েছিলঃ পাকিস্তান সরকার গত কয়েক বছর পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির দ্বারা দেশের সার্বভৌমত্ব এবং দেশের অর্থনৈতিক ব্যবসাগত ও বাণিজ্যিক স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয়েছে। এই অধিবেশনে অসাম্প্রাদায়িক রূপদানের উদ্দেশ্যে ভাসানীর প্রস্তাবে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে দলের নামকরন হয় পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ। ঐ অধিবেশনে ভাসানী সভাপতির যে ভাষন দেন তার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

পাকিস্তানের প্রতি ভাসানীর প্রথম ও দ্বিতীয় আসসালামু আলায়কুমঃ-

"শোষণ- নিপীড়ন ও অর্থনৈতিক বঞ্চনা অব্যাহত থাকলে পূর্ব পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হবেই একথা মওলানা ভাসানী শুধু ১৯৫৭ বা ১৯৭০ এ নয় এর আগেও অন্ততঃ দুবার প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা করেছেন। একবার ১৯৫৫ সালের ১৭ জুন এবং দ্বিতীয়বার ১৫ জানুয়ারী ১৯৫৬। প্রত্যেক বারই তা বিতর্কের সৃষ্টি করেছে এবং শাসনচক্র এবং তাদের তাবেদারদের সমালোচনায় সম্মুখীন হয়েছেন।" [১]

(১) সৈয়দ আবুল মকসুদ-মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, ঢাকা, বাংলা একাডেমী মে ১৯৯৪

Dhaka University Institutional Repository

"১৯৫৫ সালের ১৭ জুন রোজ শুক্রবার অপরাহ্নে ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভায় সভাপতির ভাষণ দান কালেও মওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ প্রসংগে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া ঘোষণা করেন যে, শোষন-শাসনের মনোবৃত্তি ত্যাগ না করিলে পূর্ব পাকিস্তান আসসালামু আলায়কুম বলিতে বাধ্য হইবে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান পৃথক হইয়া যাইবে। উক্ত মন্তব্য সেই সময় পশ্চিম পাকিস্তান ও কেন্দ্রীয় রাজধানী করাচিতে এক মহাআলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।"[১]

শাসক-শোষকদের নিন্দায় মোটই ভ্রুক্ষেপ ছিল না ভাসানীর, তাঁর কথা ও কাজ তিনি নির্দ্বিধায় বলে যেতেন ও করে যেতেন। ১৯৫৬ সালের ১৫ জানুয়ারী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পল্টনের এক জনসভায় তিনি পশ্চিমা শাসকদের শোষণ ও চক্রান্তের কঠোর সমালোচনা করেন। সেই সময় ইসলামী রিপাবলিক পাকিস্তানের সংবিধান রচনার কাজ চলছিল এবং প্রস্তাবিত সংবিধানের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছিল। জনসভার প্রতিবেদনে দৈনিক সংবাদ লিখেছিলঃ

"প্রস্তাবিত খসড়া শাসনতন্ত্র পাকিস্তানের সাত কোটি নির্যাতিত জনসাধারনকে চিরশৃংখলাবদ্ধ করার এক মহাষড়যন্ত্র। কিন্তু সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী জাগ্রত পূর্ব বাংলার জনসাধারন গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে শাকগোষ্ঠির এই হীন চক্রান্তকে বরদাশত করিবে না। আমরা জীবনের বিনিময়েও কায়েমী স্বার্থ বাদীদের রচিত এই গণবিরোধী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রাচীর গড়িয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর। নির্যাতিত জননেতা মওলানা ভাসানী গতকল্য অপরাহ্নে প্রাদেশিক আওয়ামীলীগের উদ্যোগে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় সভাপতির ভাষণে উপরোক্ত ঘোষণা করেন।

(১) অলি আহাদ- "জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-১৯৭৫ পৃষ্ঠা - ২৬৮

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা ভাসানী অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের প্রতিবাদে ১৬ জানুয়ারী হতে ২২ জানুয়ারী পর্যন্ত সাত দিন প্রদেশের ছাত্র, যুবক, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারনকে কালোব্যাজ ধারন করতে বলেন এবং আগামী ২৯ জানুয়ারী প্রদেশব্যাপী 'অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রতিরোধ দিবস' পালনের আহবান জানান।

সভায় আওয়ামী লীগ, গণতন্ত্রী দল, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্মপরিষদ, ও যুবলীগ প্রভৃতি বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগন খসড়া শাসনতন্ত্রের তীব্র সমালোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন। মওলানা ভাসানী কর্তৃক শাসকচক্রের বিরুদ্ধে জীবন মরণ সংগ্রামের আহবানে উপস্থিত জনসাধারন সমস্বরে হাত তুলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করেন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ও তাদের বাংগালী সহযোগীরা পূর্ববাংলাকে তাদের উপনিবেশ করার যে হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, এই নীতি অব্যাহত থাকলে এবং বাংলার স্বায়ত্তশাসন স্বীকৃত না হলে বাংগালীদের পাকিস্তানীদের সংগে থাকা সম্ভব হব না, এ' প্রসংগে মওলানা বলেনঃ- আমি আশংকা করিতেছি,পূর্ব বাংলার উপর যদি নির্যাতন ও শোষণ অব্যাহত থাকে তবে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে এই প্রদেশের জনসাধারনের ভবিষ্যৎ বংশধর নিজেদের স্বাতন্ত্র সম্বন্ধে চিন্তা করিবে।

তাঁর এই ঘোষণার ত্বরিত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং তিনি যে রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত তা, প্রচার করতে থাকেন ক্ষমতাসীন ও মুসলিম লীগ নেতারা বিশেষ করে অনেকদিন লন্ডন ও কলকাতা অবস্থান করে এসে এই জাতীয় চরমপন্থী কথা বলায় তাঁকে ভারতের দালাল হিসেবে ভূষিত করা হয়।

"তবে অবশ্যই স্বীকার্য যে, এ'ধরেনের চাপের সৃষ্টি না করলে ৫৩ এর শাসনতন্ত্রেও বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হতো না এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও অন্যান্য প্রগতিশীল যে সকল ধারা এই সংবিধানে সংযোজিত হয়েছিল তাও থাকত না। ভাসানী ইসলামী আদর্শের অবিচল সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের সংবিধানিক নাম Islamic Republic of Paksitan না করে Federal Republic of

Dhaka University Institutional Repository

Pakistan করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তিনি বলতেনঃ এই ধরনের অগণতান্ত্রিক ও গণবিরোধী সংবিধানই পাকিস্তানের কবর রচনা করবে।"[১]

আওয়ামীলীগের কাগমারী কাউন্সিল অধিবেশনে ভাসানীর ভূমিকাঃ

দু'টি প্রধান বিষয়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংগে মওলানা ভাসানীর মতপার্থক্য শেষ পর্যন্ত মীমাংসার অযোগ্য বিরোধে পর্যবসিত হয়, তার একটি অবহেলিত শোষিত পূর্ববংগের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, এবং অপরটি সকল সামরিক চুক্তি বাতিল করে করে জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ। এই দুটি ব্যাপারে সোহরাওয়ার্দী ছিলেন আপোষপ্রবন ও নমনীয়। পক্ষান্তরে ভাসানী ছিলেন অনড় ও আপোষহীন। এ দুটি অবশ্য ব্যক্তিগত কোন ব্যাপার ছিল না। এগুলো ছিল আওয়ামী লীগের নীতি। দলের দুই প্রধান নেতার মধ্যে যখন মতবিরোধ চরম আকার ধারন করে তখন দলীয় প্রধান হিসেবে ভাসানী কাগমারীতে ১৯৫৭ সালের ৭-৮ ফেব্রুয়ারী এক অধিবেশন আহবান করেন। এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণ হিসেবে তিনি বিবৃতিতে জানান যে দলীয় নেতা ও সরকার সম্পর্কে অনবরত অভিযোগ পাচ্ছেন, দেশের ও সরকারের স্বার্থে সেগুলোর আলোচনার প্রয়োজন। ১৯৫৭ সালের ১৩ জানুয়ারী পূর্ব বাংলার গরীব চাষী, মজুর, ছাত্র, যুবক ও জনসাধারনের প্রতি এক আবেদনে ভাসানী বলেনঃ

"এ দেশ শুধু মন্ত্রী, মেম্বার ও সরকারী কর্মচারীদের নহে- এ দেশ অগনিত জনসাধারনের দেশ। যাহারা এদেশ পরিচালিত করেন, তাহারা শতকরা ৯৫ জন গরীব চাষী, মূজর, কামার-কুমার প্রভৃতি সকল শ্রেনীর জনসাধারনের টাকা দিয়াই চলে। এদেশের সরকার জনগনেরই সরকার। তাই জনগনের স্বার্থরক্ষাকল্পে দূর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, চোরাকারবারী প্রভৃতি সকল রকম সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য ভয়ভীতি ত্যাগ করিয়া ঐক্যবদ্ধ হউন। পূর্ব বাংলার বাঁচার দাবী পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের দাবী এবং মহান ২১ দফার বাকী ১৪ দফা পূরণের জন্য বিচ্ছিন্ন জনশক্তিকে আওয়ামী লীগের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তুমুল আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে।" [২]

(১) সৈয়দ আবুল মকসুদ-মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, ঢাকা, বাংলা একাডেমী মে ১৯৯৪ পৃষ্ঠা ১২৮

(২) মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী আবু জাফর শামসুদ্দীন, কাগমারী সম্মেলন ১৯৫৭, স্মৃতিচারণ দৈনিক সংবাদ ৭-২-১৯৮২

Dhaka University Institutional Repository

৩ ফেব্রুয়ারী ভাসানী কাগমারীর ডাক শীর্ষক আর একটি প্রচার পত্র প্রকাশ করেন। তাতে বলা হয়ঃ

১। সাড়ে চার কোটি বাংগালীর বাঁচার দাবী আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন আদায়ের ডাক।

২। ঐতিহাসিক মহান ২১ দফা আদায়ের ডাক।

৩। চাষী, মজুর, কামার, কুমার, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবি, শিল্পী সকল শ্রেনীর মিলনের ডাক।

৪। পূর্ব বাংলার ৬০ হাজার গ্রামে আওয়ামী লীগকে সংগঠনের ডাক।

৫। ২১ দফার পূর্ণ রূপায়নের জন্য আমাদের নিরবিচ্ছিন্ন আন্দোলন মুক্তির মহান সনদ, ইহা যেন আমরা কখনো বিস্মৃত না হই।[১]

সেই সময় তাঁর দল শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে এবং আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তখন এই বক্তব্য দিয়ে একটি মহাসম্মেলনের আয়োজন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কাগমারী সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান সহ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার প্রায় সকল মন্ত্রী যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে উপস্থিত পর্যবেক্ষকদের মতে, সম্মেলনের সেই কয়েকটি দিন কাগমারীর অজপাড়াগাঁ পাকিস্তানের অস্থায়ী রাজধানী হয়ে উঠেছিল।

আওয়ামী লীগের ভেতরের ভাসানীবিরোধী উপদলটি তাঁর বিরুদ্ধে নানা ধরনের বিরুপ প্রচারনায় লিপ্ত হয়। পক্ষান্তরে বামপন্থী দলটি থাকে ভাসানীর পেছনে, সম্মেলনের প্রাক্কালে ৫ ফেব্রুয়ারী তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেনঃ

“আমি কোন প্রকার যুদ্ধজোটে বিশ্বাস করি না। বিশ্বশান্তির পরিপন্থী যেকোন প্রকার যুদ্ধজোট মানবসভ্যতা ও মুক্তির পক্ষে বাধাস্বরূপ। যত কঠিন বাঁধাই আসুক না কেন আমি পাকিস্তানের জনগনের প্রকৃত কল্যাণের জন্য স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির সংগ্রাম করিয়া যাইব। কারণ, আমি বিশ্বাস করি, এই নীতিই পাকিস্তানের জনগণের প্রকৃত মুক্তি ও শান্তির পথ প্রশস্ত করিবে।[২]

(১)সৈয়দ আবুল মকসুদ-মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, ঢাকা, বাংলা একাডেমী মে ১৯৯৪ পৃষ্ঠা ১৩৫-১৩৬

(২) দৈনিক সংবাদ ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭

Dhaka University Institutional Repository

৭ ফেব্রুয়ারী সকালে কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয় সন্তোষের জমিদারদের একটি ভবনে। অধিবেশনে ৮৯৬ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশনে ভাসানী একটি ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তার এই ভাষন প্রগতিশীলদের প্রশংসা অর্জন করে কিন্তু রক্ষণশীলদের দ্বারা কঠোভাবে সমালোচিত হয়। এই ভাষনে তিনি ক্ষমতাচ্যুত মুসলিম লীগ ও তার ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সমালোচনা করেন। তিনি বলেনঃ

"একদা মুসলিম লীগ ছিল পাক-ভারতের মুসলমানের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। পাকিস্তান কায়েম হবার পর তাঁর ক্ষমতা ও মানমর্যাদা আরো বৃদ্ধি পায়। আমি নিজেতো বটেই, আজ যারা এখানে সমবেত হয়েছেন তাদেরও অধিকাংশ মুসলিম লীগের সভ্য ছিলেন। জনসাধারনের অগাধ বিশ্বাস ছিল তখন মুসলিম লীগের উপর। কিন্তু মাত্র নয়টি বছর না যেতেই আজ মুসলিম লীগ জনসাধারনের মন থেকে ধুয়ে মুছে গেল। এত বড় একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের এরূপ অবস্থা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। [১]

এরপর ভাসানী নিজের দলের সরকার সম্পর্কে বলেনঃ

বিরোধী দলের অস্তিত্ব রাষ্ট্রের জন্য সরকারী দলের মতই সমান প্রয়োজন বলে মনে করতে হবে। মোট কথা পূর্ণ পার্লামেন্টারী শাসন এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হবে আমাদের লক্ষ্যস্থল। ইতিহাস স্বাক্ষী কোন দেশের জনসাধারন কোন কালেই ভুল করেননি। পূর্ব বাংলার বিগত সাধারন নির্বাচনে জনতা যে অপূর্ব রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রমাণ দিয়েছে, তার তুলনা নেই। এখন পর্যন্ত আমাদের অনেক কাজ বাকী। একুশ দফা ওয়াদার মূল দফা এবং আওয়ামী লীগ মেনিফেস্টোরও প্রধান কথা হল পররাষ্ট্র, মুদ্রা এবং দেশরক্ষা বিভাগ ছাড়া আর সকল বিভাগের ভার প্রদেশকে দিতে হবে। কারণ যতদিন না পূর্ব পাকিস্তান তার অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করার পূর্ণ ক্ষমতা পাচ্ছে, যতদিন না শিল্প ও বাণিজ্য রেলওয়ে, পোষ্ট অফিস প্রভৃতি বিভাগগুলির পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থানীয় সরকারের হাতে আসছে, যতদিন না পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক বিচারে দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ইউনিট বলে স্বীকার করা হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাংগীন মংগল সম্ভব নয়।

(১) দৈনিক সংবাদ ৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭

Dhaka University Institutional Repository

আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আরো অন্যান্য বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করে তিনি পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে বলেনঃ

পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে আমার বক্তব্য- 'বিভেদ সৃষ্টি কর এবং শাসন কর'- শত শত বছরের এই সম্রাজ্যবাদী নীতি এশিয়া, আফ্রিকায় ব্যর্থ হউক- দুনিয়ায় নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি স্থাপনের পক্ষে প্রবল জনমত গড়ে উঠুক।

সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী তাঁর ভাষণে সময়ের উপর নির্ভর করে বৈদেশিক নীতি নির্ধারনের পক্ষে মত দেন। তারপর তিনি মওলানা সাহেবের প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন। "আমার মনে হয় শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন আমরা পাইয়াছি। কিন্তু এমন কতকগুলি ব্যাপার যেমন, বৈদেশিক সাহায্য, কেন্দ্রীয় অর্থ বন্টন বিষয়ে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন রহিয়াছে। স্বায়ত্তশাসনের দাবী সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এই দাবীর বাস্তাব ভিত্তি নাই। সোহরাওয়ার্দী আরো বলেন, "পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আমার প্রতি তাহাদের (ভাসানীর) পার্থক্য আমার প্রতি চ্যালেঞ্জস্বরূপ"। [১]

পূর্ব পাকিস্তানের বৈষম্যের করুন চিত্রও সে সম্মেলনে ভাসানী জোরালো ভাষায় তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ১৯৫৬-৫৭ অর্থ বছরে যেখানে পূর্ব বাংলার ব্যয় হয়েছে ১৮ কোটি টাকা, সেখানে পশ্চিম পাকিস্থানে ব্যয়ের পরিমান ৪৮০ কোটি টাকা।

সে সময়ের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত ছিলেন তেমন একজন লিখেছনঃ

"পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের যে প্রশ্নটি অত্যন্ত উজ্জ্বল ছিলো সে ব্যাপারেও প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলে বসলেন-৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন হয়ে গেছে। এ'কথাটি প্রচন্ড আঘাত হানলো গোটা বাংগালী জাতিকে, এখানকার বাম প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী শক্তিকে। আওয়ামী সভাপতি মওলানা ভাসানী এই অবস্থান কিছুতেই মেনে নিতে রাজী হলেন না।

(১) সৈয়দ আবুল মকসুদ-মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, ঢাকা, বাংলা একাডেমী মে ১৯৯৪ পৃষ্ঠা ১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশ্য প্রতিবাদ তিনি জানালেন। দলের অভ্যন্তরে ছিলো চাপা বিক্ষোভ। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের বিরাট অংশই বিক্ষুব্ধ কিন্তু কেন্দ্রে ও প্রদেশে দলীয় সরকার এবং সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মতো নেতার মোহ কাটিয়ে ওঠা অনেকের পক্ষেই সম্ভব ছিলো না। হাজারো বিক্ষোভ সত্ত্বেও সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হবার পর মুসলিম লীগের পররাষ্ট্রনীতিরই সমর্থন দিয়ে যেতে লাগলেন তিনি।[১]

১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র গৃহীত হবার পর মওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান খান প্রমুখ শুধু নন গণপরিষদে স্বয়ং সোহরাওয়ার্দীই বলেছিলেন, "এই সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের লেশমাত্র স্বীকৃত হয়নি।" কিন্তু ক্ষমতাসীন হওয়ার পরেই আগের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেন এবং তিনি ও তার অনুসারীরা যেমন আতাউর রহমান খান প্রমুখ সেই সংবিধানকে প্রশংসা করেন, স্বায়ত্ত্বশাসন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের কথায় সুর নরম করেন। এসব বিষয়ের নিষ্পত্তি করতেই ভাসানী কাগমারীতে দলের অধিবেশনে আহবান করেন এবং দলীয় কর্মীদের এসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করেন।

কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনঃ-

কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠান হচ্ছে ভাসানীর সুদুর প্রসারী চিন্তা ভাবনার স্বাক্ষর, পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের রাজনীতি এবং আওয়ামী লীগ অবস্থানকারী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুচরদের চেহারা সানগ্রিকভাবে ফুটে ওঠে এই সম্মেলনে। এই সম্মেলনের মাত্র দেড় বৎসরের মধ্যে আওয়ামী পার্টির প্রতিষ্ঠা, প্রধান মন্ত্রীত্বের পদ হতে সোহরাওয়ার্দীর অপসারন এবং ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল ও সামরিক শাসন জারি প্রভৃতি ঘটনা সমূহ দ্রুত ঘটে যায়। স্বাধীন জাতি রুপে বাংগালী ও বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার সাংস্কৃতিক ভিত্তি ভূমি নির্মানে কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন হচ্ছে ভাসানীর অতীব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদক্ষেপ।

(১) রমেশ মৈত্র- ইতিহাসে মানদন্ডে বাংলাদেশে বাম আন্দোলনঃ ইতি কর্তব্য-৫, দৈনিক আজকের কাগজ, ১৩ জুন ১৯৯৩

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা ভাসানী সংস্কৃতিকে তার রাজনীতি থেকে আলাদা করে দেখেননি। আমৃত্যু তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির জন্য ভেবেছেন এবং সাধ্যমতো কাজ করেছেন। সেই আসাম যুগ থেকেই তিনি তাঁর রাজনৈতিক সভা ও কৃষক সম্মেলনের সংগে অনিবার্যভাবে যুক্ত রাখতেন নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এমন কি তাঁর আয়োজিত ধর্মীয় সভাগুলোতেও অনেক সময় গানবাজনার ব্যবস্থা রাখতেন। সারা জীবন তিনি তার জনসভাগুলোয় প্রায়ই আমন্ত্রন জানাতেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবিদের ভাষন দেবার জন্য। তাঁর সংগে যোগাযোগ যুগপৎ উচ্চশিক্ষিত নাগরিক সংস্কৃতিসেবীদের এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকশিল্পীদের।

অসংখ্য সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন সারাজীবন। কিন্তু তাঁর অবিস্মরনীয় কীর্তি এদেশের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৯৫৭তে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান সাস্কৃতিক সম্মেলন যা কাগমারী সম্মেলন নামে পরিচিত। এটি পূর্ব বাংলার সর্বকালের বৃহত্তম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই শুধু নয়, এদেশের জাতীয় রাজনীনিতে এর তাৎপর্য অপরিসীম।

আবু জাফর শামসুদ্দীন কাগমারী সম্মেলন সম্পর্কে এক বিশ্লেষণে যথার্থই বলেছেনঃ "আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়, কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন বাংগালী জাতীয়বাদ এবং তার ফল স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সাংস্কৃতিক ভিতভূমি নির্মাণের দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার অন্যতন। ১৯৪৮-৫২ সালের ভাষা আন্দোলন/বাহান্নর ২১ ফেব্রুয়ারী তারিখে কোন অবস্থাতেই প্রত্যাবর্তন নয়, বিন্দুতে উপনীত হয়।[১]

(১) আবু জাফর শামসুদ্দীন, কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন ১৯৫৭ স্মৃতিচারণ দৈনিক সংবাদ ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৮২

Dhaka University Institutional Repository

শহীদের রক্তে উত্তপ্ত বাংগালী জাতীয়তাবাদের বীজ। সাংস্কৃতিক চৈতন্যোদয়ের প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনারূপে আমরা ২১ ফেব্রুয়ারী তারিখটিকে প্রতি বছর স্মরন করি। সাম্প্রদায়িক নাম বর্জন করে ১৯৫৫ সালে অসাম্প্রদায়িক আওয়ামী লীগ দলের প্রতিষ্ঠানকে আমি সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘোড় পরিবর্তনসূচক মনে করি। স্মরনীয় যে, তৎকালীন পূর্ববংগ আইন পরিষদ এবং পাকিস্তান গণপরিষদের ভেতরে এবং বাইরে দেশের বৃহত্তম বিরোধী দলরূপে আওয়ামী লীগ যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে যে আন্দোলনের সূত্রপাত করে তার ফলে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে যুক্ত নির্বাচন প্রথা গৃহীত হয়।

জাতি মাত্রেরই সংস্কৃতি আছে। বাংগালী জাতি একটি সুপ্রাচীন যৌথ সংস্কৃতির অধিকারী। এ সংস্কৃতিতে আধিবাসী হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, প্রভৃতি সকল সম্প্রদায় ও বর্ণের বিশিষ্ট অবদান আছে। বাংগালী জাতির যৌথ উদ্যোগ ও আয়োজনে শত বৎসরব্যাপী গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে সৃজিত বাংগালীর আলাদা জাতীয় সত্তা ও সংস্কৃতির প্রতি বর্হিবিশ্বের রাজনৈতিক দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করে কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন। কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিল না। সোহরাওয়ার্দী সাহেব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সত্য কিন্তু পাকিস্তান তখন কুখ্যাত বাগদাদ প্যাক্টের সদস্যরূপে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগ কাউন্সিল তাঁর ১৯৫৬ সালের ১৯-২০ মে তারিখের অধিবেশনে যে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করে তাঁর প্রথমটিতে বাগদাদ চুক্তিসহ “সকল প্রকার সামরিক চুক্তির তীব্র নিন্দা ও বিরোধীতা করা হয়েছিল। ঐ প্রস্তাব ছিলো তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সচেতন জনমতের প্রতিধ্বনি। প্রকৃতপক্ষে বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সাহেব এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা ভাসনীর মধ্যে কিছুকাল পূর্ব থেকেই মতবিরোধ চলছিল। এই অনিশ্চিত রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে কাগমারীতে পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের ঘোষণা পাকিস্তানের প্রকৃত শাসক শ্রেনীর অন্তরে জুজুর আতংক সৃষ্টি করেছিল। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতিরূপে মওলানা ভাসানী সাহেব সম্মেলন আহবান করেন

Dhaka University Institutional Repository

নি। মওলানা সাহেবের উদ্যোগ এবং নির্দেশেই সম্মেলন আহবান করা হয় বটে, কিন্তু তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন, কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধানরূপে নয়"। [১]

পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ছাড়াও বিদেশের বহু মনীষী এই সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন। সময়ের স্বল্পতায় কারণে অনেক দেশের গুণিজন এতে যোগ দিতে পারেন নি। তবে তারা দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে পাঠিয়েছিলেন বাণী।

৮ ফেব্রুয়ারী বিকেল তিনটে সম্মেলনের মূল সভাপতি ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান মওলানা ভাসানী লক্ষ লক্ষ জনতায় উদ্দেশ্যে এক জ্বালাময়ী ভাষন দেনঃ- বক্তৃতার এক পর্যায়ে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকশ্রেনীর উদ্দেশ্যে তাঁর সুবিখ্যাত আসসালামু আলায়কুম উচ্চরণ করেণ। ঐ আসসালামু আলায়কুমের তাৎপর্য উপস্থিত শ্রোতা ও যাদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়েছিল তারা উভয় পক্ষই উপলব্ধি করেছিলন। আমার ক্ষুদ্র মতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্পষ্ট দাবী এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় সংগ্রাম ও ত্যাগের সংকল্প আসসালামু আলায়কুম ধ্বনির মাধ্যমে ঘোষিত হয়েছিল। [২]

৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারী তিনটি বড় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিদেশীদের মধ্যে অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন মিশর থেকে ডঃ চার্লস জে. এডামস বৃটেন থেকে ডঃ এফ.এইচ. কওসন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিভেভ গার্থ, জনৈক জাপানী প্রতিনির্ধি, ভারত থেকে এসেছিলেন হুমায়ন কবির, তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, প্রবোধকুমার স্যান্টাল, রাধারানী দেবী, মিসেস সোফিয়া ওয়াহিদা।

(১) আবু জাফর শামসুদ্দীন, কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন ১৯৫৭ স্মৃতিচারণ দৈনিক সংবাদ ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৮২

(২) আবু জাফর শামসুদ্দীন, কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন ১৯৫৭ স্মৃতিচারণ দৈনিক সংবাদ ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৮২

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান থেকে যারা প্রবন্ধ পড়েছিলেন অথবা বক্তৃতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পুস্তক একাডেমীর চেয়ারম্যান মওলানা আবদুর কাদের।

টাংগাইল থেকে সন্তোষ পর্যন্ত মোট ৫১টি তোরণ। সর্বশেষ এবং সর্বপ্রথম তোরণ ছিল কায়েদ-ই-আযম তোরণ। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান সহ প্রাদেশিকমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহারাওয়ার্দী সহ সকল বাংগালী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সম্মেলনে হাজির হয়ে ছিলেন।

প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো। এসব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন-রমেশ শীল, তসের আলী, মোসলেম, রাম সিং, মজিদ মিয়া মুখেন্দু চক্রবর্তী, আব্বাস উদ্দিন, বেদারুদ্দিন, সোহরাব হোসেন প্রমুখ ছাড়াও ঢাকা রেডিওর শিল্পীবৃন্দ, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, ঢাকা, রংপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলার নানা স্থান হতে আগত শিল্পীর দল, লালন শাহ দল, ইয়ুথ লীগ, লাঠি তরবারি এবং রামদা খেলার দল, পশ্চিম পাকিস্তানী লোকনৃত্য দল, নাদাম আজুরী ও তার দল এবং বহু একক শিল্পী ও গায়ক গারিকা। তা ছাড়া নানা রকম কুটিরশিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের একটি সুন্দর প্রদর্শনীও খোলা হয়েছিল।

কাগমারী সাংস্কৃতির সম্মেলন আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল সেটা বড় কথা না, কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে এটা হয়ে থাকলো একটি মাইলফলক- বাংগালীর স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে এক চিরস্মরনীয় ঘটনা। ভাসানী টাংগাইল- কাগমারী সড়কের নাম দিয়েছিলেনঃ "বিশ্বভ্রান্তত্ব ও স্বাধীনতার সড়ক"।

কাগমারী সম্মেলনে ভাসানীর প্রতিক্রিয়াঃ-

মওলানা ভাসানীর প্রদত্ত জ্বালাময়ী ভাষণ এবং তাঁর আসসালামু আলায়কুম উচ্চারনের বিরুদ্ধে জঘন্য ভাষায় কুৎসা রটনার মতো পত্র-পত্রিকা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে প্রচুর ছিল, কিন্তু তাদের অতিরিক্ত অভিযোগের জবাব দেয়ার মতো ভাসানী সমর্থক বা নিরপেক্ষ কাগজের সংখ্যা ছিল তখন অতি অল্প।

কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানী বলেছিলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের শোষন যদি বন্ধ না হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে, যখন

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব পাকিস্তান হয়তো পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আসলামু আলাইকুম' জানাইবে। অর্থাৎ পাকিস্তান হইতে পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হইয়া যাইবে।

কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানীর কঠোর ভাষণ এবং তাঁর আসসালামু আলায়কুম যে বিতর্কের সূচনা করে তাতে আওয়ামী লীগের শীর্ষনেতা প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী বিব্রত হন। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্যে তিনি ভাসানীর পক্ষ সমর্থন করে একটি নমনীয় বিবৃতি দেন। ১৯৫৭ সালের ১৬ ফেব্রুয়ায়ী দেশের সমস্ত পত্র পত্রিকায় তাঁর বিবৃতিটি প্রকাশিত হয়। ইত্তেহাদে চার কলাম ব্যাপী লিভ সংবাদঃ মওলানা ভাসানী কখনোই পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার হুমকি প্রদান করেননি। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া সোহরাওয়ার্দীর বিবৃতি মতভেদসৃষ্টি কারীদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার অনুরোধ। পুরো সংবাদটি নিম্নরূপঃ করাচি, ১৫ ই ফেব্রুয়ারী (এ.পি.পি) "সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কাগমারী সম্মেলনের কার্যক্রম লইয়া যে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার নিরসনকল্পে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আহবায়ক জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আজ রাত্রে এখানে এক বিবৃতি প্রসংগে বলেন যে, মওলানা ভাসানী কোনদিনই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করিবার হুমকি প্রদান করেন নাই। তিনি আওয়ামী লীগ সদস্যদের ভ্রান্ত ধারনা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকিবার অনুরোধ জানান।" [১]

কাগমারী সম্মেলনের সাফল্যে মওলানা ভাসানী সাড়াশি আক্রমনে সম্মুখীন হন। সে উত্তাল ঝড়ের মুখে তিনিও তাঁর সমর্থকরা রাজনৈতিক ভাবে অসহায় ও বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ার উপক্রম হন। তাই এক পর্যায়ে তিনি এবং তাঁর অনগতরা আসসালা মুআলাইকুমের একটি নমনীয় ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য হন। উল্লেখিত বিবৃতিগুলোতে তৎকালীন পরিস্থিতি আঁচ করা হয়। কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানী স্বায়ত্ত শাসনের দাবী তুললেন পক্ষান্তরে সম্মেলন থেকে ঢাকা ফিরে সলিমুল্লাহ হলে ছাত্রদের সভায় সোহরাওয়ার্দী ঘোষণা করলেন পূর্ব পাকিস্তানের ৯৮ ভাগ স্বায়ত্ত শাসন অর্জিত হয়ে গেছে। এই নিয়ে দু'দল ছাত্রের মধ্যে প্রচণ্ড মারামারি হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে।

(১) এ, পি,পি, পরিবেশিত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭ সংবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

সোহরাওয়ার্দী আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভায় বামপন্থীদের সংগে একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা চালান কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। ১৯৫৫ সালের সে অধিবেশনের প্রস্তাবাবলি যেমন পূর্ববাংলার পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন, পাকিস্তানের জোট নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি, বাগদাদ চুক্তি বাতিলের দাবী ইত্যাদি নিয়ে সে সভায় দীর্ঘ আলোচনা চলে। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী প্রমুখের মার্কিন ঘেষা ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংগে সহযোগিতার নীতির বিরুদ্ধে ভাসানী ও তাঁর অনুগতরা অবিচল থাকেন। উভয় পক্ষই তাঁদের এই অনমনীয় মনোভাবের পরিনতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। কিন্তু দলের কাউন্সিলরদের পাল্লা ক্ষমতাসীন সোহরাওয়ার্দীর দিকেই ভারি ছিল। তাই আওয়ামী লীগের ভাংগন অবশ্যাম্ভাবী হয়ে পড়ে এবং ভাংগনের জন্য সোহরাওয়ার্দীর উপদল ভাসানীকেই ধালাওভাবে দায়ী করে।

আওয়ামী লীগের সংগে সম্পর্কচ্ছেদঃ

কাগমারী সম্মেলনের পর মওলানা ভাসানী ও ভাসানীপন্থী বাম নেতা ও কর্মীদের আওয়ামী লীগের সংগে থাকা আর সম্ভব ছিলো না। তা ছাড়া তারা ছিলেন দলের মধ্যে সংখ্যালঘু। প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ও মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খাঁন এবং তাদের সহকর্মী ও সমর্থকদের সংগে নীতির প্রশ্নে আপোষের কোন সুযোগ ছিলো না। তারা বলছিলেন পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন হয়েই গেছে এবং মার্কিনপন্থী জোটভূক্ত পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিলে সোহরাওয়ার্দী অনীহা ছিল। এসব প্রশ্নে ভাসানী ছিল অবিচল আওয়ামী লীগে তিনি শুধু প্রতিষ্ঠাতা নন আপ্রাণ চেষ্টায় দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে তুলেছেন, সে দলের পতাকার নীচে সমবেত করেছেন দেশের সকল এলাকার সকল সম্প্রাদায়ের মানুষকে। আওয়ামী লীগ আজ কেন্দ্রে ও প্রদেশে ক্ষমতাসীন। দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি সত্ত্বেও পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ সরকার কিছু প্রগতিশীল কাজও করেছে। আওয়ামী লীগের প্রধান তিনি, সে দল পরিত্যাগ করার মুহূর্তে তিনি মানসিকভাবে আঘাত পেয়েছিলেন কিন্তু আদর্শ ও নীতির সংগে আপোষ করা তারপক্ষে সম্ভব ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৭ সালের ১৮ মার্চ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সন্তোষে গেলে ভাসানী তাকে বলেন যে, তিনি দল থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এবং তিনি তাঁর পদত্যাগের একটি চিঠি দিয়ে বলেন যে, চিঠিটি তিনি যেন ঢাকায় এসে সংবাদের সম্পাদক জুহুর হুসেন চৌধুরীর কাছে পৌছে দেন। চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন সাধারন সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমানের বরাবর। তাঁর স্বভাবসুলভ ভংগীতে লেখা পত্রটি ছিলো এ'রকমঃ

"জনাব পূর্বপাক আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী সাহেব, ঢাকা।

আরজ এই যে, আমার শরীর ক্রমেই খারাপ হইতেছে এবং কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবার খুলিতে হইবে, তদুপরি আওয়ামীলীগ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার লীডার সদস্যদের নিকট আওয়ামী লীগের ওয়াকিং কমিটির প্রস্তাব ২১ দফা ওয়াদা অনুযায়ী জুয়া, ঘোড়দৌড়, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি হারাম কাজ বন্ধ করিতে, সামাজিক ও ধর্মীয় বিবাহ বন্ধনের উপর ট্যাক্স ধার্য করা জনমত অনুযায়ী বাতিল করিতে আবেদন জানাইয়া ব্যর্থ হইয়াছি। ভয়াবহ খাদ্য সংকটেরও কোন প্রতিকার দেখিতেছিনা। ২১ দফা দাবির অন্যান্য দফা যাহাতে অর্থব্যয় খুব কমই হইবে তাহাও কার্যকরী করিবার নমুনা না দেখিয়া আমি আওয়ামী লীগের সভাপতি হইতে পদত্যাগ করিলাম। আমার পদত্যাগপত্র গ্রহন করিয়া বাধিত করিবেন।[১]

ইতি-

মোঃ আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

কাগমারী- ১৮-৩-১৯৫৭

জহুর হোসেন চৌধুরী এবং শেখ মুজিব একমত হন যে এ ব্যাপারে মওলানার সংগে দেখা করে কথা বলা দরকার। তাদের ধারনা ছিলো যে, ভাসানীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে বুঝালে তিনি দলত্যাগের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার বা পুনর্বিবেচনা করবেন।

(১) অলি আহাদ- "জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-১৯৭৫ পৃষ্ঠা - ২৭৪

Dhaka University Institutional Repository

১৮ মার্চের চিঠির পর ১২ মার্চ ভাসানী একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। যার শিরোনাম ছিলো-আওয়ামীলীগ কর্মী ও দেশবাসীর প্রতি আবেদন" এগুলো থেকে প্রমানিত হয় তিনি আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেননি এবং আওয়ামী লীগকেই নতুন করে গঠন করতে চেয়েছেন। ভাসানী আজীবন প্রতিকূলতার মধ্যেই তাঁর নিজস্ব রাজনীতিতে অবিচল ছিলেন। কখনোই কোন অপবাদ ও নিন্দাকে তিন গ্রাহ্য করেন নি।

ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠনঃ

মওলানা ভাসানী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে নবগঠিত দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি নিজেই এবং সাধারন সম্পাদক হন মাহমুদুল হক ওসমানী। পূর্ব পাকিস্তান কমিটির সভাপতি হন মওলানা ভাসানী এবং সাধারন সম্পাদক মাহমুদ আলী। পশ্চিম পাকিস্তান কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন আব্দুল গাফফার খান এবং সাধারন সম্পাদক মাহমুদ আলীকাসুরী। এছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটি ও দুই প্রাদেশিক কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত থাকেন দুই অঞ্চলের বিশিষ্ট বামপন্থী নেতৃবৃন্দ, যাঁদের অনেকেই ছিলেন কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য বা কর্মী। এই জন্যই ন্যাপের বিরোধীরা একে একটি সোভিয়েত রক্ষাকারী "ছদ্মবেশী কমিউনিষ্ট পার্টি বলে অভিহিত করতো এবং ভাসানীকে ডাকতো 'রুশ ভারতের দালাল' বলে। অত্যন্ত প্রতিকুলতার মধ্যেই এগোতে হয় ন্যাপকে, তবু পাকিস্তানের দুই অংশেই অল্পদিনের মধ্যে এই দলটি জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

হাজারো প্রতিকুলতাকে মাথায় নিয়ে শত অপপ্রচার, হামলা, আঘাত ইত্যাদিকে বরণ করে নিয়েই নবজাত বামপন্থী ব্যাপক ভিত্তিক দল হিসেবে ন্যাপ যাত্রা শুরু করলো। প্রাদেশিক পরিষদে ন্যাপের সদস্য সংখ্যা দাড়ালো ৩১ জন। এই প্রদেশের নানা জলো ও মহকুমায় ন্যাপের সম্মেলন হতে থাকলো, গঠিত হতে থাকলো নতুন দলের জেলাও মহকুমা কমিটি সমূহ। সে সময় দেখা যেত যেখানেই ন্যাপের সম্মেলন বা জনসভা হতো সেখানেই আওয়ামীলীগের কর্মীরা সশস্ত্র হামলা করতো।

Dhaka University Institutional Repository

তখন পর্যন্ত পাকিস্তানে যতোগুলো রাজনৈতিক দল ছিলো তারমধ্যে সবচেয়ে অগ্রসর, প্রগতিশীল ও গণমূখী কর্মসূচী ও আদর্শ ছিলো ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির। এ লক্ষ্য ও কর্মসূচী প্রণয়নের ব্যাপারে শিক্ষিত বামপন্থী কর্মীদের অসামান্য ভূমিকা ছিলো। অবশ্য আওয়ামীলীগের নীতিও ছিলো গণমূখী ও জনপ্রিয় কিন্তু ন্যাপের লক্ষ্য ও আদর্শে যুক্ত হয় জনকল্যাণমুখী, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল ধারা।

সামরিক শাসন ও কারাবরণঃ

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র এগার বছরের ইতিহাসে প্রবর্তিত হলো প্রথম সামরিক শাসন। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও পাকিস্তানের সর্বোচ্চ সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল মুহাম্মদ আইয়ুব খান দেশে সামরিক আইন জারি করেন। মাত্র ২০ দিন পর ২৭শে অক্টোবর তিনি রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দর মির্জাকে অপসারিত করে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়ীত্ব গ্রহণ করেন। সামরিক আইন জারির সংগে দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং রাজনীতিবিদদের জীবনে নেমে আসে নির্যাতন নিপীড়ন। যেদিন সামরিক আইন জারি করা হয় সেদিন মওলানা ভাসানী মির্জাপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেখান থেকে ১২ অক্টোবর তাঁকে পাকিস্তানে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয় এবং সেখান থেকে নিয়ে আসা হয় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে।

"যে কারণ দেখিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় তাতে বলা হয় সরকারের কাছে এমন নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদি রয়েছে যার ভিত্তিতে বলা যায় যে, তাঁর কার্যকলাপ পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিপদজনক"[১]।

একই পত্রে সরকার আরো যে সব কারণ উল্লেখ করে তার মধ্যে ছিলঃ

ক) কোন কোন দেশ সম্পর্কে তিনি এমন উক্তি করেছেন যাতে মনে হতে পারে সে সব দেশ পাকিস্তানের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন।

(১)বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্রঃ ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ২

Dhaka University Institutional Repository

খ) বিভিন্ন শ্রেনীর মধ্যে ঘৃণার উদ্রেক করে পাকিস্তানের সংহতি ও ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকর প্রচারনা।

গ) তাঁর এ জাতীয় কাজে তিনি শত্রুভাবাপন্ন দেশ থেকে সাহায্য ও প্ররোচনা পাচ্ছেন।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে ঐদিনই দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হন আবুল মনসুর আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান, হামিদুল হক চৌধুরীসহ চার প্রাক্তন মন্ত্রী, তিনজন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এবং তিনজন পদস্থ কর্মকর্তা। সর্বস্তরের প্রগতিশীল নেতাকর্মী নানাভাবে হয়রানি হতে থাকেন। প্রতিদিনই জারি হতে থাকে নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা ও কালাকানুন। উল্লেখ্য যে কোন ধরনের মৌলিক অধিকার না থাকায় এ সকল নির্যাতনের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ না আইনের আশ্রয় নেয়া সম্ভব ছিলো না।

ভাসানীর চীন সফরের অনুভূতিঃ

১৯৬৩ সনের ২৪ সেপ্টেম্বর মওলানা ভাসানী চীন সফরের উদ্দেশ্যে পিকিং এর পথে ঢাকা ত্যাগ করেন। চীনে সাত সপ্তাহ ব্যাপক সফরের পর দেশে প্রত্যাবর্তনের পর ভাসানী "সাপ্তাহিক জনতা" পত্রিকায় তাঁর ভ্রমনবৃত্তান্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেন। পরে সেই লেখগুলো মাও-সে- তুঙ এর দেশে নামে গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে। এই ভ্রমন কাহিনী জননেতার স্বহস্তে লিখিত নয়, তিনি মুখে বলে গেছেন অন্য কেউ তা লিপিবদ্ধ করেছেন। এই বই যে, শুধু তাঁর চীন সফরের উপর এক প্রামান্য দলিল তাই নয়, এর প্রতি লাইনে প্রকাশ পেয়েছে সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভংগী- সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তাঁর অবিচল সমর্থন।

ভাসানীর চীন ভ্রমন নিয়ে রাজনৈতিক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। একদিকে ক্ষমতাসীন আইয়ুব সরকার চীনের সংগে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করছে, অন্যদিকে ভাসানীরও রয়েছে সমাজতান্ত্রিক চীনের প্রতি পক্ষপাত। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সংগে তাঁর সাক্ষাৎকার এবং তার পরপরই তাঁর চীন সফরে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো খুব স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেনি। এতে ভাসানী সমালোচনার সম্মুখীন হন। ভাসানীকে অভিযুক্ত করা হয় আইয়ুবকে সমর্থনের অভিযোগে। পক্ষান্তরে তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

নিজের দলের ভেতরের একাংশ যারা সোভিয়াতে পদ্ধতির সমাজতন্ত্রের অনুসারী তাঁরাও মওলানা প্রতি ক্ষুদ্ধ হন। এই সফরের কারণে কিছু সময়ের জন্য তিনি রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়েন।

১৯৬৪ সালে মওলানা ভাসানী চীনে যান এবং চীনা নেতৃবৃন্দের সংগে আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক প্রশ্নে আলাপ আলোচনা করেন। তাঁর পরপর দু'বার চীন সফর দেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাঁর এই সফর পাকিস্তানের অর্থাৎ আইয়ুব সরকারের বৈদেশিক নীতির উপর বিশেষ প্রভাব ফেলে।

তবে মাও-সে-তুঙ এর অনুরোধেই হোক বা সে সময়ের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতেই হোক ভাসানী আইয়ুবের পররাষ্ট্রনীতিকে কিছুদিন সমর্থন দিয়েছেন এবং এক পর্যায়ে যখন আইয়ুব ভিয়েৎনামে মার্কিন বর্বরতার বিরোধিতা করেছিলেন তখন তার বৈদেশিক নীতিকে প্রগতিশীল বলেও তিনি আখ্যায়িত করেন। তবে আইয়ুবের একনায়কত্ববাদী নীতির তিনি অনবরত সমালোচনা ও নিন্দা করেছেন। আইয়ুবের আমলে বিপুল সংখ্যক ন্যাপকর্মী ও নেতা নির্যাতন ভোগ করেন।

১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধে ভাসানীঃ

"১৯৬৫ সালের প্রথম দিক থেকেই ভারত পাকিস্তান সম্পর্কের অবনতি ঘটছিল। মাঝে মাঝেই পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে সংঘর্ষ হচ্ছিল। এ'জন্যে এক দেশ অপর দেশকে দোষারোপ করত। মূল সমস্যা ছিল কাশ্মীর ও অন্যান্য কয়েকটি বিতর্কিত এলাকা। সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানের জাতীয় জীবনে তথা উপমহাদেশে দেখা দেয় মহাবিপর্যয়। ৬ সেপ্টেম্বর শুরু হয় ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ। এই যুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তান আক্রান্ত হলেও পূর্ব পাকিস্তান ও তাতে মানসিকভাবে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। সেজন্য এখানকার মতাদর্শ নির্বিশেষে সকল বিরোধী দল আইয়ুব সরকারকে যুদ্ধমুহুর্তে সমর্থন জানায়। পশ্চিম পাকিস্তানের সংগে সংহতি প্রকাশের জন্য বাংলাদেশের কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক-শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিশেষ করে যারা ও মধ্যবয়সী তাঁরা ভারতীয় আক্রমনের নিন্দা করেন। ১৩ সেপ্টেম্বর মওলানা ভাসানী এক বিবৃতি দিয়ে এই যুদ্ধের নিন্দা করেন এবং কাশ্মীরে গণভোট অনুষ্ঠানের দাবী জানান। এই যুদ্ধের জন্য ভাসানী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে

Dhaka University Institutional Repository

দায়ী করেন। উল্লেখযোগ্য যে, ষাটের দশকে আমেরিকার সংগে আইয়ুব সরকারের সম্পর্ক তেমন ভাল যাচ্ছিল না, যে টুকু ভাল ছিল সে টুকু থাকলে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে ব্যবহার করা যায়। যুদ্ধের কয়েকদিন ভাসানী ও তার দলের নেতারা যশোর, ঈশ্বরদী, কুষ্টিয়া, ফেনী, চট্টগ্রাম, রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি জায়গায় অসংখ্য জনসভায় ভাষণ দেন।তখনকার বিশ্ব জনমত ছিল মোটের উপর পাকিস্ত-ানীদের পক্ষে" ।[১]

প্রায় প্রত্যেকটি সভায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করে ভাসানী ভারত ও আমেরিকা সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি পাকিস্তান সরকারকে আমেরিকার সংগে সম্পাদিত সকল যোগাস চুক্তি বাতিলের দাবি জানান। তিনি জাতিসংঘে নীরব ও সাক্ষীগোপালের মত ভূমিকা পালনের নিন্দা জানিয়ে সরকারকে বলেনঃ "প্রয়োজনে আমাদের জাতিসংঘ থেকে বেরিয়ে আসার কথা ভাবতে হবে।" তিনি বলের এই যুদ্ধের পেছনে মার্কিনীদের মদদ রয়েছে। এর মধ্যে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে মধ্যস্থতা করার প্রস্তাব আছে তখন তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাকে স্বাগত জানান।

নারায়নগঞ্জে আওয়ামীলীগের আয়োজিত এক জনসভায় শেখ মুজিবর রহমান, তাজুদ্দিন আহমদ প্রমুখ প্রধান নেতা কাশ্মির সমস্যা সমাধান না হওয়ার জন্য জাতিসংঘের ভূমিকার সমালোচনা করেন। শেখ মুজিব তাঁর ভাষনে "ভারতীয় আক্রমন প্রতিহত করার ব্যাপারে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর তৎপরতা ও বীরত্বের প্রশংসা করেন। এই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ প্রস্তুতিতে সমগ্র জাতি যে ভাবে সাড়া দিয়েছে তাহার প্রশংসা করেন।" [২]

"এর মধ্যে পাকিস্তান সরকারের ভারত বিদ্বেষ হিন্দু বিদ্বেষে পরিণত হয় এবং পূর্ববাংলার হিন্দুরা পরিণত হয় পাকিস্তানীদের শত্রুতে। এখানকার বহু হিন্দু এই যুদ্ধের প্রকাশ্যে নিন্দা করেছেন, যারা ধনী তারা যুদ্ধ তহবিলে টাকা দান করেছেন।

(১) দৈনিক পাকিস্তান, ২২ অক্টোবর ১৯৬৫

(২) দৈনিক পাকিস্তান, ২২ অক্টোবর ১৯৬৫

Dhaka University Institutional Repository

তবুও সরকার হিন্দু বিদ্বেষ উস্কিয়ে দেয়। ২৫ অক্টোবর ৬৫ পার্বতীপুরে এক জনসভায় ভাসানী সরকারকে সতর্ক করে দেন যেন কোন অবস্থাতেই এখানকার হিন্দুরা নির্যাতনের শিকার না হন বা নিরাপত্তহীনতায় না ভোগেন। তিনি বেতার প্রভৃতিতে সাম্প্রদায়িক প্রচার বন্ধের আহবান জানান।"[১]

'ছয়-দফায় পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোন কথা নাই এবং কৃষক শ্রমিক তথা মেহনতি মানুষের অধিকারের কোন স্বীকৃতি নাই বলে ভাসানী ছয় দফাকে সমালোচনা করেন। অবশ্য স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে ছয় দফা গতিবেগ সঞ্চার করায় তিনি পরে আর এটির সমালোচনা করেন নি।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারে ভাসানীর ভূমিকাঃ

১৯৬৮ সাল নাগাদ আইয়ুব সরকারের কারাগারগুলো ভরে গিয়েছিল প্রগতিশীল বিরোধী দলীয় নেতাদের দ্বারা ন্যাপ, কমিউনিষ্ট পার্টি ও আওয়ামীলীগের নেতাদের মধ্যে তখন জেলে ছিলেন মনি সিং, হাজী দানেশ, শেখ মুজিবুর রহমান, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, মনিকৃষ্ণ সেন, অমূল্য লাহিড়ী, নগেন সরকার, তাজুদ্দিন আহমদ, সিরাজুল হোসেন খান, মতিয়া চৌধুরী সহ অন্ততঃ তিন শতাধিক রাজনৈতিক নেতা। এতো নেতাকে কারা নির্যাতনে রেখেও সরকার সুখ পাচ্ছিলো না। ৬ জানুয়ারী ১৯৬৮ সরকার বিভিন্ন পেশার ২৮ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে এক প্রেসনোটে বলেঃগ্রেফতারকৃতদের কেউ কেউ আগরতলায় (ভারতীয় ভূ-খন্ডে) গমন করেন এবং মেজর মেনন ও অন্যান্যের সহিত তাহাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করেন।

"তাদের বিরুদ্ধে এই মামলা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত হয়। এই ২৮ জনের মধ্যে শেখ মুজিবের নাম ছিল না, কিন্তু কয়েকদিন পর ১৮ জানুয়ারী ইসলামবাদ থেকে সরকারের আর এক প্রেসনোটে জানা যায় "ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা ও পরিচালনার সাথে শেখ মুজিবর রহমানের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কাজেই অন্যান্যের সাথে তাঁকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। উল্লেখ্যযোগ্য যে, পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে তিনি আগে থেকেই জেলে ছিলেন"।[২]

(১) সৈয়দ আবুল মকসুদ-মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, ঢাকা, বাংলা একাডেমী মে ১৯৯৪ পৃষ্ঠা ২৬৯

(২) সংবাদ ৭ জানুয়ারী ১৯৬৮

Dhaka University Institutional Repository

"১৫ জানুয়ারী ১৯৬৮ ভাসানী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "ক্ষমতাসীন সরকার হইতেছে সাম্রাজ্যবাদ বিশেষত মার্কিন স্বার্থের মুখপাত্র এক স্বৈরাচারী সরকার। এই সরকারের বিরুদ্ধে এই গনতান্ত্রিক ঐক্যফ্রন্ট গঠনের জন্য তিনি আহবান জানান। তিনি বলেন, যাহাদের সহিত অতীতে এবং সম্প্রতি তাঁহার রাজনৈতিক মতপার্থক্য দেখা দিয়াছে তাহাদের সকলের সংগেই তিনি আন্দোলনের মাঝে পুনরায় একত্রিত হইবেন এবং প্রয়োজনবোধে আবার কারাগারে যাইবেন। তিনি সকল রাজনৈতিক বন্দীর ও সকল মিথ্যা হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারে দাবি জানান।"[১]

"শেখ মুজিবকে ষড়যন্ত্র মামলায় জড়ানোর পর ভাসানী ২৮ জানুয়ারী পল্টন ময়দানে জনসভা করার অনুমতি চাইলে সরকার তাঁর আবেদন প্রত্যাখান করে। তারপর বাধ্য হয়ে ঢাকার বাইরে, তিনি ২৭ জানুয়ারী কুষ্টিয়ায় এক জনসভা করে বলেনঃ সরকার যা আরম্ভ করেছে এ অবস্থা চলতে থাকলে আমরা আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করতে বাধ্য হব। তিনি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ওপর জোর দেন। ষড়যন্ত্র মামলায় ভারতীয় দুতাবাসকে জড়ানোর জন্য তিনি নিন্দা করেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যে ছিলঃ পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন, সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি ও জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার"।[২]

এরপর চারদিকে চাঞ্চল্যকর আগরতলা ষড়যন্ত্র মালার শুনানি চলতে থাকে, অন্যদিকে ভাসানী সারা দেশ সফর করে জনগনকে বৃহত্তর সরকার বিরোধী আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হতে বলেন।

গণঅভ্যুত্থানের উদ্যোক্তা হিসেবে ভাসানীর ভূমিকাঃ

আসামে লাইন প্রথা বিরোধী আন্দোলন এবং চুয়ান্নর মুসলিম লীগ বিরোধী আন্দোলনের পর ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে মওলানা ভাসানী আর একবার জাতীয় রাজনীতির কান্ডারীরুপে আবির্ভূত হলেন। ১৯৬৮-৬৯ সালের সেই আন্দোলনেই লৌহ মানব আইয়ুব খাঁনকে দেশের ভাগ্যবিধাতার আসন থেকে বিদায় নিতে হয়। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় শুধু দেশবাসীর কাছে নয় বিশ্ববাসীর কাছে ভাসানী পরিণত হলেন এর প্রবাদ পুরুষে।

(১) সংবাদ ১৬ জানুয়ারী ১৯৬৮

(২) এ.পি.পি, পরিবেশিত সংবাদ, দৈনিক পাতিস্তান, ২৮ জানুয়ারী ১৯৬৮

Dhaka University Institutional Repository

আইয়ুব শাসনের শেষের দিকে, যখন এক ব্যক্তির শাসন চিরস্থায়ী করার জোর আয়োজন চলছিল, নেতৃত্বহীন অবস্থাতেই সাধারন মানুষ বিশেষ করে যুব সম্প্রদায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেগে উঠে এবং কায়েমী স্বার্থবাদী ভূ-স্বামীগন রাজনীতিতে তাঁদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। সিন্ধু বেলুচিস্তান সীমান্ত প্রদেশ এমনকি ক্ষমতাসীনদের দুর্গ পাঞ্জাব পর্যন্ত জ্বলে উঠে, আইয়ুবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় গোটা পশ্চিম পাকিস্তান ১৯৬৮ র শেষ দিকে আকস্মিকভাবে অবস্থায় দ্রুত পরিবর্তন ঘটে।

১৯৬৮'র ৫ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ঢাকা আসেন। ঐ একই দিন পল্টনের এক বিরাট জনসভায় ভাসানী সমাজ পরিবর্তনের জন্য বর্তমান শাসক-শোষকদের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের ডাক দেন। তিনি স্বায়ত্বশাসন, সার্বজনীন ভোটাধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি দাবী আদায়ের লক্ষে আন্দোলনের আহবান জানান।

৯ তারিখে দিনাজপুরের এক সভায় আইয়ুব বলেন যে, যে কোন অবস্থাতেই তিনি দেশকে বিচ্ছিন্ন হতে দেবেন না। তিনি ভাসানীর সাম্প্রতিক আন্দোলনের সংহতি স্বাধীনতা, ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী শক্তির প্রতি কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

১৯৬৮-৬৯ এর গণ-আন্দোলনের শীর্ষ স্থানীয় নেতা ভাসানী হলেও সে আন্দোলনে অন্যান্য ডাক ও বামপন্থী দলের নেতারাও অসামান্য অবদান রাখেন। এই আন্দোলনেই আইয়ুবের পতন ঘটে সেটাই ভাসানীর কৃতিত্ব নয়। এই আন্দোলনে তাঁর অসামান্য অবদান রাখেন। এই আন্দোলনেই আইয়ুবের পতন ঘটে সেটাই ভাসানীর কৃতিত্ব নয়। এই আন্দোলনে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকার কারণ অন্যত্র নিহিত। অতীতে এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রধান অংশগ্রহণকারী ছিলো শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেনী। ভাসানী অবিস্মরণীয় ভূমিকা এখানে যে তিনি তড়িৎ গতিতে শহরে আন্দোলনকে গ্রামের নিম্ন ও মধ্য শ্রেনীর সাধারন মানুষের রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিনত করেন।

আইয়বের দুর্নীতিপরায়ন মৌলিক গণতন্ত্রী ও গ্রামের মোড়ল- মহাজনদের নির্মূল করার লক্ষ্যেই মজলুম নেতা উদ্ভাবন করেন নতুন রাজনৈতিক কৌশল। ঘেরাও আন্দোলন। ইতোমধ্যে সরকার বিরোধী আন্দোলন সকল পেশার ও সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ব বাংলাকে শান্ত করার জন্য এ সময় কেন্দ্রীয়

Dhaka University Institutional Repository

আইনমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হবেন একজন পূর্ব পাকিস্তানী। কিন্তু জনসাধারন আর কোন অবস্থাতেই এক ব্যক্তি বা দুই ব্যক্তির শাসন মেনে নিতে রাজী ছিল না।

ইতোমধ্যে জাগ্রত ছাত্রসমাজ জংগীরূপ নিয়ে গণতান্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ৫ই জানুয়ারী বৃহত্তম আন্দোলনের লক্ষ্যে ১০ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১৪ তারিখে এরা ঘোষণা করেন তাঁদের বিখ্যাত ১১ দফা কর্মসূচী যা তৎক্ষনাৎ ছাত্রজনতার স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থন পায়। ১১ দফার মধ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত দাবিদাওয়া ছাড়া সবই ছিলো রাজনৈতিক দাবী যেগুলোর জন্য এদেশের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে আসছিল।

গণআন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে ভাসানী, অন্যান্য প্রায় সকল রাজনৈতিক নেতার মতো, ঢাকায় বসে না থেকে বেড়িয়ে পড়েন এক ঝটিকা সফরে। এসব সভায় বদরুদ্দিন ওমর সহ অনেক খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী ও কমিউনিষ্ট নেতারা তাঁর সংগে ছিলেন।

জ্বালাও-পোড়াও ঘেরাও আন্দোলনে ভাসানীঃ

১৯৬৯ সালের জানুয়ারী মাসে ছাত্ররা গণ আন্দোলনে আর এক গতিবেগ সঞ্চার করে। ১৭,১৮ এবং ১৯ তারিখ ঢাকায় ছাত্রদের সংগে পুলিশের সংর্ঘষ হয় এবং ছাত্র বিক্ষোভের চতুর্থ দিনে ২০ জানুয়ারী চলন্ত জীপ থেকে জনৈক পুলিশ অফিসার রিভালবারের গুলিতে ছাত্র ইউনিয়নের নেতা আসাদুজ্জামানকে হত্যা করে এবং অপর তিন জনকে আহত করে। এই বর্বরতার প্রতিবাদে ২১ জানুয়ারী পূর্ণ হরতাল পালিত হয় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের আহবানে। ঐদিন আসাদের জানাজায় পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক মানুষ শরীক হয়। এদিকে অব্যাহত থাকে ভাসানীর ‘জ্বালাও-পোড়াও-ঘেরাও আন্দোলন’।

১ ফেব্রুয়ারী আইয়ুব খান রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে এক গোলটেবিল বৈঠকের আহবান জানান। দলীয় কাউন্সিল অধিবেশনে আইয়ুবের গোলটেবিলে যোগ না দেবার কথা পুনরায় ঘোষণা করেন মওলানা ভাসানী। পক্ষান্তরে সকল বামপন্থী দল ও ছাত্রদের এগার দফার সমর্থকদের নিয়ে তিনি ঐক্যফ্রন্ট গঠনের ওপর জোর দেন।

Dhaka University Institutional Repository

ঐদিনই খুলনা মিউনিসিপ্যাল পার্কে এক বিরাট জনসভায় ভাসানী বলেনঃ এগার দফা মেনে নিলে আমি গোলটেবিল বৈঠকে যেতে রাজী আছি। তিনি বলেন এগার দফা ও ন্যাপের চৌদ্দ দফায় কোন পার্কক্য নেই। সুতরাং এগুলো মেনে নিলে তবেই সরকারের সংগে বৈঠক তার আগে নয়। ভাসানী সহ দেশের নেতৃবৃন্দ ও জনতার দাবীর মুখে ৬৯ সালেই ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রথম সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়।

ভাসানী বিভিন্ন জনসভায় ভাষন দেন এবং সরকারবিরোধী আন্দোলনে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য জনগনের প্রতি আহবান জানান। এসব বিশাল জনসভায় তাঁর প্রদত্ত ভাষনের মূল বক্তব্য ছিলঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, বড় বড় পুঁজিপতির বিলোপ ঘটানোর জন্য কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত সমাজের সচেতনভাবে সংঘবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে না।

ভাসানীর গোল টেবিল বৈঠক বর্জনঃ

ছাত্রজনতার উত্তাল আন্দোলন এবং ব্যক্তিগতভাবে মওলানা ভাসানীর অব্যাহত চাপের মুখে সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে এবং বিনা শর্তে শেখ মুজিবরকে মুক্তি দেয়। দীর্ঘ দিন ধরে এই ঘৃন্য মামলা প্রত্যাহারের জন্য তিনি দাবী জানিয়ে আসছিলেন এবং নীতিগত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও পুত্র তুল্য মুজিবের মুক্তির জন্য ব্যক্তিগত প্রভাবও ব্যবহার করেছিলেন। যাহোক ২২-২-৬৯ সালে শেখ মুজিব মুক্তি পান এবং দেশের মানুষ এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে হাফ ছেড়ে বাঁচে। এর আগেই আইয়ুব ঘোষণা করেছিলেন, তিনি পরবর্তী নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হবেন না। তার আইনমন্ত্রী এস.এম জাফর আভাস দিয়েছিলেন, তিনি পরবর্তী নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পূর্ব-পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত হবেন। গোলটেবিল বসা সহ এসবই ছিলো পূর্ব বাংলার আন্দোলনকে প্রশমিত করার কৌশল। মুক্তি পেয়ে ঐদিনই রাতে মুজিব ভাসানীর সংগে সাক্ষাৎ করেন এবং দীর্ঘ সময় তাদের মধ্যে আলোচনা হয়। তবে আলোচনাকালে ভাসানী মুজিবকে গোলটেবিলে যেতে বারণ করেন। ভাসানী মুজিবের সংগে আলোচনার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকা এসেছিলেন পিপলস পার্টির নেতা ভূট্টো, কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন ও আরো

Dhaka University Institutional Repository

অনেকে আলোচনা করে। ভাসানী তাদের বলেন যে, শোষক ও শোষিত এক টেবিলে আলোচনায় বসলে শোষকেরই জয় হয়, শোষিতের নয়।

সামরিক শাসন ও আইয়ুবের পতনে ভাসানীঃ

গোল টেবিল বৈঠকের পরেও দেশের অবস্থা মোটেও শান্ত হল না। জ্বালাও, পোড়াও, ঘেরাও আন্দোলন অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের কুখ্যাত গভর্ণর মোনায়েম খানকে অপসারন করা হয়। তাতেও পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হয় না। ৮ মার্চ পশ্চিম পাকিস্তান ন্যাপের আমন্ত্রণে ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তান সফরে যান। সেখানে ১৬ মার্চ শাহীওয়াল রেল ষ্টেশনে তাঁর ওপর জামাতে ইসলামীর গুন্ডাবাহিনী আক্রমণ চালায়। তাতে দেশের বিবেকসম্পন্ন সমস্ত নেতা কর্মী মর্মাহত হন। পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানকালে সেখানে বিভিন্ন ছোটবড় জনসভা এবং সমাবেশে ভাষণ দেয়া ছাড়াও তিনি সেখানকার বহু বিরোধী দলীয় নেতার সংগে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। ৯ মার্চ পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান ভূট্টোর সংগে তাঁর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভাসানী ভূট্টো চুক্তিটি হলো ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে পূর্ন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা খ) পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শের সংগে সংগতি রেখে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং গ) সবরকম বিদেশী হস্তক্ষেপ অপসারন, সকল প্রকার উপনিবেশবাদ, নয়া উপনিবেশবাদের বিরোধীতা, সাম্রাজ্যবাদের বিরোধীতা, এবং সিয়েটো, সেন্টোসহ সকল সামরিক চুক্তি থেকে দেশকে বের করে আনার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করা।

কোন ক্রমেই আর আইয়ুবের পক্ষে ক্ষমতায় থাকা সম্ভব নয় ভেবে তিনি ২৪ মার্চ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে এক দীর্ঘ চিঠি দিয়ে তাঁকে ক্ষমতা গ্রহনের আহবান জানান। তার সে চিঠির এক জায়গায় তিনি বলেন, “যে দুটি বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো বিবেচনার জন্য জাতীয় পরিষদ আহবান করার কথা আমি বিবেচনা করেছিলাম কিন্তু এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সে চেষ্টা অর্থহীন। পরিষদের সদস্যরা আর স্বাধীন জনপ্রতিনিধি নন এবং যে দুটি বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো বিশ্বস্ততার সংগে গৃহীত হবে এমন সম্ভবনা নেই।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরো বলেন যে, পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীকে অবশ্যই বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হবে।"[১] ২৫ শে মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। সংবিধান বাতিল করা হয় এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ ভেংগে দেয়া হয়। পরদিন ইয়াহিয়া এক বেতার ভাষনে বলেন, প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একটি জাতীয় পরিষদ পরবর্তী সংবিধান প্রণয়ন করবে। এভাবেই অবসান হলো আইয়ুব যুগের।

আইয়ুবের পতনে ভাসানী যে অবিস্মরনীয় অবদান রাখেন তার জন্য সমগ্র বিশ্বে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন দেশের পত্র পত্রিকায় তিনি সংবাদ হয়ে দেখা দেন। আমেরিকার বিখ্যাত "সাপ্তাহিক টাইম" তাকে "Prophet of Violence" হিংসার অবতার অভিধায় ভূষিত করে। টাইম লিখেঃ আকণ্ঠবিস্তৃত দাড়ি এই মানুষটির উজ্জ্বল মুখমন্ডলে পরলৌকিক প্রশান্তির ছাপ। পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা থেকে ৬০ মাইল দূরে একটি একটি গ্রামে তিনি নাতি-নাতনীদের কাছে যেমনি স্নেহপরায়ন এক খেলার সাথী, তেমনি দেশের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র বাংগালী কৃষকের কাছে এই ৮৬ বছর বয়স্ক আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রানের হুজুর। কিন্তু এই দয়ালু স্নেহশীল দাদুই পাকিস্তানের রাজনৈতিক অংগনে হিংসাত্মক কার্যকলাপের একজন প্রধান উদ্যোক্তা। একজন শুধুমাত্র একজন মানুষই গত মাসে (মার্চ ১৯৬৯) পাকিস্তানের পেসিডেন্ট এবং লৌহ মানব নামে খ্যাত আইয়ুব খানকে গদিচ্যুত করতে বাধ্য করেছেন। এই মুহূর্তে ভাসানীই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ভৌগোলিকভাবে বিভক্ত গোলযোগপূর্ণ দেশে সামরিক আইন দিয়ে ভাংগুর শান্তি ফিরিয়ে আনলেও তিনিই এখন সেই সামরিক আইনের একমাত্র একক আতংক স্বরুপ। বেতের টুপি মাথায় আটতে আটতে এবং সবুজ সোয়েটারটা শরীরে লাগাতে লাগাতে টাইম পত্রিকার সংবাদদাতা ডান কোগিনকে মওলানা বলেন, "আমি আমার দেশবাসীর জন্য ফাঁসিতে ঝুলতেও প্রস্তুত।"[২]

(১) অলি আহাদ- "জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-১৯৭৫

(২) সাপ্তাহিক টাইমস ১৮ এপ্রিল ১৯৬৯ সংখ্যায় প্রতিবেদনের বঙ্গানুবাদ

Dhaka University Institutional Repository

সকল রাজনৈতিক নেতা যেখানে ভয়ে চুপ করে আছেন ভাসানী সেখানে নীরবতো ননই বরং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসন এবং প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়ার প্রতি নোটিশ জারি করেছেন ভাসানী সহ দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সংগে শীঘ্র দেশের সমস্যাসমূহ সমাধান করার জন্য আলোচনা শুরু না করলে তিনি আবার আন্দোলন শুরু করবেন।

মওলানা ভাসানী অধিকতর অর্থনৈতিক সুবিধাভোগী পশ্চিম পাকিস্তানের জুলুমের বিরোধী। তিনি অবিলম্বে দীর্ঘকালের পুরানো বৈষম্যের সমাধান দাবী করেন। তা না হলে মওলানা বলেন- জনগন আইয়ুবের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে যা করেছে, জেনারেল ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধেও তাই করতে বাধ্য হবে। কিন্তু এবারের আন্দোলন আরো ভয়াবহ হবে।

স্বাধীনতা ঘোষণাঃ

৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ এ অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের প্রস্তুতি যখন দেশের আকাশবাতাস মুখর তখন ১২ নভেম্বর বাংলাদেশর উপকুল অঞ্চলে সর্বকালের নৃশংতম ঘুর্নিঝড় ও জলোচ্ছাস আঘাত হানে। নিহত হয় অন্ততঃ দশ লক্ষ বাংগালী, জীবম্মৃত হয়ে পড়ে থাকে লক্ষ লক্ষ। ঐ সময় ঢাকার একটি ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন ছিলেন ভাসানী। সেই মহাপ্রলয়ের খবর শোনামাত্র রোগশয্যা থেকে উঠে পড়েন লোক নায়ক। সেখানে গিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়বহতা দেখে কান্নায় ভেংগে পড়েন এবং শাসকদের হৃদয়হীনতায় ক্রোধে জ্বলে ওঠেন তিনি। পাকিস্তান সরকার দুর্গতদের সাহায্য ও উদ্ধার কাজের জন্য ক্ষমাহীন ঔদাসীন্যের পরিচয় দেয়। অথচ বাংলার উপকুলে এই ভয়াবহ দুর্যোগের খবর পেয়ে বিভিন্ন দেশ থেকে ত্বরিত গতিতে আসতে থাকে সাহায্য সামগ্রী। সেই মহাদুর্দিনে বাংগালীদের জন্য যেসব দেশ থেকে সাহায্যের হাত প্রসারিত হয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, বৃটেন, ফ্রান্স, অস্ট্রোলিয়া প্রভৃতি দেশ কিন্তু আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানী

Dhaka University Institutional Repository

ভাইয়েরা রইলেন নিশ্চুপ। সর্বপ্রথমেই ভাসানী এবং পরে শেখ মুজিব বিশ্ববাসীর কাছে আমাদের ত্রাণ কাজের জন্য আবেদন জানান।

দুর্গত এলাকার ত্রানকার্য পর্যবেক্ষন করে ঢাকায় এসে এক ঐতিহাসিক জনসভায় ভাষণ দেন মজলুল নেতা। তাঁর আর কোন দাবী ছিল না একেবারে নাটকীয়ভাবে সরাসরি ঘোষণা করেন। "পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা" কবি শামসুর রহমানের ভাষায় "হায় আজ একি মন্ত্র জপেলেন মওলানা ভাসানী"। ২৩ নভেম্বর আকাশবাণী দিল্লি থেকে প্রচারিত হয়ঃ পূর্ব পাকিস্তানের বর্ষিয়ান জননেতা মওলানা ভাসানী স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। ২৪ নভেম্বেরের দৈনিক পাকিস্তানের চারকলাম ছবি শুদ্ধ বিরাট রিপোর্টঃ সর্বশক্তি ও সম্পদ নিয়ে এগিয়ে আসুন, বাংগালীর জীবনে আজ মহাদুর্যোগ নেমে এসেছে- মওলানা ভাসানী।

সরকার ও সরকারী প্রচার যন্ত্রের কঠোর সমালোচনা করে মওলানা ভাসানী বলেন যে, আমাদের লক্ষ লক্ষ ভাই বোনের মৃত্যুর সংবাদ রেডিও পাকিস্তান ও সরকার আমাদের জানায়নি। আট হাজার মাইল দুর থেকে বিবিসি মারফত আমরা এই দুঃসহ সংবাদ জানতে পেরেছি। এছাড়া দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে সাংবাদিক ও আলোকচিত্র শিল্পীরা এগিয়ে আসলেও আমাদের ইসলামাবাদের সরকার দুর্গত বাংগালীর সাহায্য এগিয়ে আসেন নি।

তিনি সরকারের পদত্যাগ দাবী করে বলেন যে, বাঙ্গালীর দুঃখের দিনে সরকার সাহয্য নিয়ে এগিয়ে আসেননি। অথচ কথায় কথায় জাতীয় সংহতি ও ভ্রাতৃত্বের কথা বলা হয়ে থাকে। এ'সব সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব বোগাস।

এই পর্যায়ে মওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ শ্লোগান দিলে জনসমুদ্র থেকে তার সোচ্চার প্রতিধ্বনি ওঠে। এ'ছাড়া বর্তমান সরকারের পদত্যাগ দাবী করে মওলানা ভাসানী একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলে জনতা হাত তুলে তার প্রতি সমর্থন জানায়।

নির্বাচনের প্রসংগ উল্লেখ করে মওলানা ভাসানী বলেন, আমাদের কাছে নির্বাচনের চেয়ে মানুষ বড়। আমরা নির্বাচন করবো না। দুর্গত মানুষের সেবায় আমরা আমাদের সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে যাব। এ'অবস্থায় কেউ যদি নির্বাচন করতে চায় তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

Dhaka University Institutional Repository

এই সময় সভার মধ্য থেকে নির্বাচন বিরোধী শ্লোগান দেয়া হয়। সরকারী কর্মচারীদের গাফলতি ও মানবতাবিরোধী কার্যের সমালোচনা করে মওলানা ভাসানী বলেন, দুর্গত মানুষের বাঁচার দাবি নিয়ে আমরা সংগ্রাম করবো। ঘেরাও আন্দোলন চালিয়ে যাবো। আপনারা কি এই আন্দোলন সমর্থন করবেন? সমবেত জনতা সমস্বরে হাত তুলে তা সমর্থন করেন।

এই পর্যায়ে "জ্বালো, জ্বালো, আগুন জ্বালো" শ্লোগান উঠলে মওলানা ভাসানী বলেন আমরা গর্ভণর হাউস জ্বালাবো না। আদমজী ইস্পাহানীর মিল কারখানা পোড়াব না। কারণ এগুলো জনগনের সম্পদ। আমরা আল্লাহর নামে এ'সব সম্পদ জাতীয়করন করব।

এ'বছরে পূর্ব বাংলায় পরপর দু'বার বন্যায় ও তিনবার ঘুর্ণিঝড়ের বর্ণনা দিয়ে ভাসানী বলেন, বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগে সোনার বাংলা শ্মাশান হয়ে গেছে। বাংগালীর ঘরে আজ আর কিছুই নেই। কংকালসার দেহনিয়ে তারা মৃত্যুর সংগে সংগ্রাম করে বেঁচে আছে। কিন্তু বহু আবেদন নিবেদন করেও বন্যা নিয়ন্ত্রন করা গেল না। দৈনিক পাকিস্তান একটি সরকারী পত্রিকা মওলানা ভাসানীর জ্বালাময়ী বক্তৃতা যতোটা সম্ভব নরম করে প্রকাশ করে তারা। তা'সত্ত্বেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ভাসানী পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন। এর আগে এক খবরে দৈনিক পাকিস্তানে বলা হয়, ১৮ নভেম্বর মওলানা ভাসানী দুর্গত অঞ্চলে যাবার চেষ্টা করলে তাঁর জাহাজ পতেংগায় থামিয়ে রাখা হয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামে ভাসানীর ভুমিকা ঃ

বাংলাদেশ সারাবিশ্বে আজ এক স্বাধীন দেশ বলে পরিচিত। এই স্বাধীনতার মূল প্রবক্তা ছিলেন মাওলানা ভাসানী । ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৬৯ এর গণআন্দোলনে বাংলার মানুষ তার নিজের যে, শক্তির পরিচয় পেল তার ফলে তারা আর বঞ্চিত নিপীড়িত থাকতে চাইলো না। তারা স্বাধীনতা চাইলো। উনসত্তরের গণআন্দোলনে বাংলার মানুষের যে জাগরণ ও শিক্ষা হয়েছিল সেই জাগরন ও শিক্ষার ফলে তাদেরকে দমনের ক্ষমতা আর কারুই রইল না । বাংলার জনগন এর

Dhaka University Institutional Repository

পরের বছরই স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং কেবল মাত্র স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে। এর মূল চালিকা শক্তি নিঃসন্দেহে ছিলেন মওলানা ভাসানী।

১৯৭১ সনের ২৫ শে মার্চ পাক বাহিনী বাঙ্গালীদের রাতের অন্ধকারে আক্রমন করে। ২৬ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষনা করেন। এবং পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার জন্য সকলের প্রতি নির্দেশ দেন। শেখ মুজিব কে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। পাক বাহিনী হাজার হাজার বাঙালীকে হত্যা করে। মুক্তি বাহিনী তাদের প্রতিহত করতে থাকে। ভাসানী তখন সন্তোষের পাশে বিন্নাফৈর গ্রামে ছিলেন। ৩রা এপ্রিল পাক সেনারা তাঁর সন্তোষের বাসগৃহ ভস্মীভুত করে। তিনি ১৬ ই এপ্রিল আসামে পৌছেন এবং ১৭ই এপ্রিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মইনুল হক চৌধুরী ও আসামের স্বরাস্ট্র মন্ত্রী সৈয়দ আহমেদ আলীর সাথে দেখা করেন। পাক বাহিনীর নির্যাতন বন্ধের জন্য ভারতের সাহায্য কামনা করে ২৩শে এপ্রিল তাঁর এক সুদীর্ঘ বিবৃতি প্রচারিত হয়। ২৫শে এপ্রিল তিনি রুশ নেতাদের কাছে তারবার্তা প্রেরণ করেন। ৩১শে মে তিনি বলেন, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি লোক পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর সংগে জীবন মরণ সংগ্রামে লিপ্ত। তারা মাতৃভূমি রক্ষা করার জন্য বদ্ধপরিকর।তারা এ সংগ্রামে জয়লাভ করবেই। তিনি আসাম থেকে কোলকাতায় চলে আসেন এবং এপ্রিলের শেষে মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। ২১ এপ্রিল তিনি জাতিসংঘ, চীন ও অন্যান্য রাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানান। এই সময় আওয়ামী লীগের দলীয় সরকার গঠিত হওয়ায় বামপন্থী দলগুলো মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহনের সুযোগ থেকে অনেক খানি বঞ্চিত হয় ৩০ও ৩১ মে বেলেঘাটায় বামপন্থী রাজনীতিকদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং ১লা জুন "বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটি" গঠিত হয়। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে সমন্বয় কমিটি গঠিত হলেও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। ভাসানী ন্যাপ, পূর্ব বাংলা কৃষক সমিতি, পূর্ববাংলা শ্রমিক ফেডারেশন ও পূর্ববাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন প্রভৃতি দল এই সমন্বয় কমিটির অন্তভূক্ত ছিল। তারা একটি ঘোষনাপত্র প্রকাশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

২৪শে জুন মওলানা ভাসানীর বিবৃতি স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত হয়। এই সময় মওলানা ভাসানী অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার জন্য দিল্লী যান এবং সেখানে প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সাথে আলোচনা করেন। এদিকে মুজিব নগর সরকারের মন্ত্রীসভায় অন্যান্য দল থেকে মন্ত্রী নেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি হয়। এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য তিনি মুজিব নগরে চলে আসেন। তাঁর সভাপতিত্বে মুক্তিযুদ্ধকে চালিয়ে নেয়া এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে উপদেশ দেয়ার জন্য সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। মওলানা ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহম্মেদ, কংগ্রেসের মনোরঞ্জন ধর, কমিউনিষ্ট পার্টির কমরেড মণি সিংহ, আওয়ামী লীগের তাজ উদ্দিন আহমেদ খন্দকার মুস্তাক আহমেদ সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ছিলেন। মওলানা ভাসানী মুক্তিযুদ্ধকে সাফল্যের পথে পরিচালিত করার জন্য মুজিব নগর সরকারের সর্বাত্মক সমর্থন দিয়েছেন। অনেকে বলেন, ভারত সরকার তাঁকে অন্তরীন করে রেখেছিলেন। তাদের এ অভিযোগ সত্য নয়। চীনপন্থী দলগুলো তাঁকে ব্যবহার করে মুক্তিযুদ্ধ ভিন্ন খাতে নিয়ে যেতে পারে- এই মনোভাব থেকে তিনি তাদের এড়িয়ে চলতেন। জনমত গঠনে প্রয়োজন পত্র পত্রিকা, প্রচার পত্র প্রভৃতি। ভাসানী ভারতে অবস্থান কালে বহু বিবৃতি প্রদান করেছেন। তাঁর বেশ কয়েকটি বড় বিবৃতি প্রচার পত্র আকারে মুদ্রিত করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং পশ্চিমবঙ্গ আসাম ও ত্রিপুরা বাঙ্গালী অধ্যুষিত অঞ্চলে বিলি করা হয়। তাছাড়া ১৯৭১ সালের ১ নভেম্বর “গণ মুক্তি” নামে একটি সাপ্তাহিক বের করেন ভাসানী। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বমূহুর্ত পর্যন্ত সাপ্তাহিক “গণ মুক্তি” প্রকাশিত হয়। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ মুক্তহয়ে বিশ্বে একটি সার্বভৌম দেশ হিসাবে আত্ম প্রকাশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় - ৫

মওলানা ভাসানীর স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতি।

(১৯৭১-১৯৭৬) ইং

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীন দেশে নির্যাতিত মানুষের সংগ্রামে ভাসানী ঃ-

ভারতে নয় মাস তাঁকে নজরবন্দী করে রাখলেও ভারত সরকার উপমহাদেশের এই সংগ্রামী মহান নেতার সু-চিকিৎসার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে যখন যা প্রয়োজন সেদিকে দৃষ্টি রেখেছেন। তিনি বিদেশী সরকারের কাছে পেয়েছেন জাতীয় নেতার মর্যাদা, পক্ষান্তরে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও বাঙ্গালী জাতিসত্তার উদ্যোগতা পুরুষ এবং বাঙ্গালী জাতীর স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক, যার প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব স্বাধীন হয়েছে বাংলাদেশ। তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর সহকর্মীদের দ্বারা গঠিত সরকার থেকে পেলেন মাঘের শীতল অভ্যর্থনা। যেন ভারতের আশ্রয় গ্রহনকারী এক কোটি শরণার্থীর একজন হয়েই তিনি দেশে ফিরলেন।

ভারত থেকে প্রত্যাবর্তনের দুদিন পর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে আপোষহীন মজলুম জননেতা ভাসানী বলেন-আওয়ামী লীগ শোষনহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যতোদিন কাজ করবে এবং দেশের ও জনগণের কল্যাণের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নেবে ততদিন তিনি সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে যাবেন। তিনি বলেন, "মুজিবকে আমি চিনি। সে আমার ছেলের মতো। কিন্তু এখন তাঁর ঘাড়ে কঠিন দায়িত্ব, এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে অতীতের স্বৈরাচারী সরকারগুলোর মতো তার সরকারের পতন অনিবার্য।"[১]

দেশে ফেরার এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি ন্যাপের সকল কমিটি বাতিল করে সর্বত্র এডহক কমিটি গঠন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সম্মেলনে দেশ গড়ার কাজে সহযোগিতা করার জন্য ১০ দফা প্রস্তাব গ্রহন করা হয়। এই সময়ে তিনি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উপরই সর্বাধিক জোর দেন। দেশে বৈদেশিক সাহায্যেরও প্রয়োজন, তবে সাহায্য নিতে গিয়ে কারো কাছে যেন জাতির মাথা নত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে সরকারের তিনি পরামর্শ দেন।

স্বাধীন বাংলাদেশের সত্যিকার অর্থে প্রথম বিরোধীদলের গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে ন্যাপ। ন্যাপই প্রথম শুরু করে স্বাধীন দেশে বিরোধী রাজনীতির। পাক হানাদার বাহিনীকে সহযোগিতা দেয়ার জন্য ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক মশিয়ুর রহমান সহ বেশ কিছু নেতা-কর্মীকে দল থেকে বহিস্কার করেন ভাসানী।

(১) সাপ্তাহিক হক কথা ১৭ মার্চ ১৯৭২

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারী মাসে ন্যাপ ও কৃষক সমিতির সদস্যদের দেয়া ব্যক্তিগত লিখিত নির্দেশের এক জায়গায় বলেন, "আমার সহিত আপনারা নিশ্চয়ই একমত হইবেন যে, এক শ্রেণীর দুস্কৃতিকারী মুজিব বাহিনী কিংবা মুক্তিবাহিনী বলিয়া পরিচয় দিয়া সারা বাংলাদেশে যে অরাজগতা সৃষ্টি করিয়াছে, ইহার আশু প্রতিকার না হইলে অচিরেই ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে। আমি সরকার ও জনসাধারণের নিকট আকুল আবেদন জানাইতেছি রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কালবিলম্ব না করিয়া এই সব কঠোর হস্তে দমন করুন।"[১]

১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান দুদেশের মধ্যে ২৫ বছর মেয়াদী এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন। এক সপ্তাহ পরে সাংবাদিক সম্মেলনে এই চুক্তি সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে ভাসানী বলেন- "আমি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্ব কামনা করি। কিন্তু দু'দেশে সত্যিকার সমাজতন্ত্র কায়েম না হলে বন্ধূত্ব টিকে থাকবে না। আমি বিশ্বাস করি প্রভুত্বমূলক বন্ধূত্ব নয়, ভ্রাতৃত্বধর্মী বন্ধূত্বই টিকে থাকে। আমি বরাবরই যুদ্ধেজোটের ঘোর বিরোধী। আমরা ভারতসহ সকলের সাথেই মৈত্রী চুক্তি করবো,সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্য চুক্তি করবো। কিন্তু কোন যুদ্ধজোট সে ভারত, রাশিয়া বা আমেরিকা যার সাথেই হোক না কেন, আমি আর বিরোধিতা করবো।"[২] স্বাধীন বাংলাদেশে এটাই ছিলো মওলানা ভাসানীর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলন।

১৯৭২ সালের ২ এপ্রিল ঢাকার পল্টন ময়দানে স্বাধীনতার পর তাঁর প্রথম জনসভায় এক বিশাল জনসমুদ্রে কালবৈশাখী ঝড়ের প্রতিকুলতা সত্বেও বিপুল করতালি এবং "স্বাধীনতার প্রথম প্রবক্তা মওলানা ভাসানী জিন্দাবাদ" ধ্বনির মধ্যেই জনগনের প্রতিক্ষিত নেতা ভাসানী বিকেল সোয়া চারটায় মাইকের সামনে দাঁড়ান। বৃষ্টিতে ভিজে লক্ষ জনতার উদ্দেশ্যে তিনি বক্তৃতা করতে থাকেন। শিলাবৃষ্টির কারণে মাত্র সাত মিনিট বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন "বাংলাদেশের মানুষ ব্রিটিশের গোলামীকে বরদাস্ত করে নাই। পিন্ডির জিঞ্জির ছিন্ন করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে এ বাংলার বীর জনগন।

(১) সাপ্তাহিক হক কথা ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২

(২) সাপ্তাহিক হক কথা ২৪ মার্চ ১৯৭২

Dhaka University Institutional Repository

আমরা হিন্দুস্থান, রাশিয়া, চীন অথবা আমেরিকার গোলামী স্বীকার করবো না। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের বীর জনতা এবং সরকার সাহায্য করেছে, সেজন্য আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ আছি, থাকব। এ সাহায্যের প্রতিদান আমরা প্রয়োজনে অন্যভাবে অবশ্যই দেবো। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করেছে এ কথা বলে যদি বাংলার মানুষকে আবার গোলামীর বন্ধনে আবদ্ধ করতে চায়, তবে আমরা মেনে নেবো না"। [১]

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আমরা আওয়ামী লীগের সরকারকে সাহায্য করবো । অনেকে লুটপাট সমিতি করে সারা দেশে প্রতিযোগিতা করে অপরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করছে। আওয়ামী লীগের ভিতরের এই আবর্জনা সাফ করতে হবে। তাদের সংশোধন করতে চেষ্টা করবো। যদি তারা তাতেও সংশোধিত না হয়, তবে তাদের কপালে দুঃখ আছে।

শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্দেশ্যে ভাসানী বলেন- "মুজিব তোমার পপুলারিটি ভাঙ্গিয়ে আওয়ামী লীগের এক দল লোক বাড়ি-গাড়ি ও ব্যাংকের মালিক হবার চেষ্টা করছে। তুমি এদের দমন করো। তা না হলে তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তুমি লুটপাট সমিতি বন্ধ করে মানুষকে খেতে পরতে দাও-অন্যথায় তোমার সমস্ত জনপ্রিয়তা ধুলিস্যাৎ হয়ে যাবে।

404103

দেশের খাদ্য পরিস্থিতি ও চালের অগ্নিমূল্যের উল্লেখ করে তিনি দুর্ভিক্ষের গ্রাস থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি প্রশাসন যন্ত্রের আমূল সংস্কার দাবি করে বলেন, মেহেনতি মানুষের রক্তে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে।মেহেনতি মানুষ আর কারো গোলামী মেনে নেবে না। স্বাধীনতা গুটিকয়েক লোকের ছেলে খেলা নয়। রাবিশ পরিষ্কার করে প্রশাসন যন্ত্রকে পূনর্গঠন করো।"

তিনি আরো বলেন "শাসনতন্ত্রে গণমানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন না ঘটলে, অন্য কেউ এ শাসনতন্ত্র গ্রহন করলেও, আমি তা মানবো না।" ভাসানী উচ্চারণ করেন, "এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এতো রক্ত পৃথিবীতে কেউ দেয়নি। পৃথিবীর কোনো দেশের ইতিহাসে স্বাধীনতার জন্য দুলক্ষ নারীকে সতীত্ব বিসর্জন দিতে হয় নি।"

তিনি বলেন, "যদি দেশে সত্যিই গণতন্ত্র কায়েম করতে চাও, তবে শক্তিশালী বিরোধী দল গড়তে দাও, সরকারকে কঠোর সমালোচনার সুযোগ দাও।"

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কালবৈশাখীর কারণে ২ এপ্রিলের জনসভা ব্যাহত হওয়ায় ৯ এপ্রিল পুনরায় পল্টন ময়দানে জনসভা ডাকা হয়। ওই দিনও লক্ষ জনতার উদ্দেশ্যে ভাসানী উচ্চারণ করেন "শাসনতন্ত্রে কৃষক-মজুরের বাঁচার দাবি বাক-স্বাধীনতা এবং সকল শ্রেণীর মানুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে তা মানবো না, মানবো না, মানবো না।" তিনি শাসণতন্ত্রের প্রশ্নে সকল শ্রেণীর প্রতিনিধির মতামত নেবার জন্য সরকারকে পরামর্শ দেন।

১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে গণপরিষদকে দেশের শাসনতন্ত্র তৈরীর এক্তিয়ার দেয়া হয় এবং আইন মন্ত্রী ড.কামাল হোসেনের নেতৃত্বে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। ১০ এপ্রিল এই কমিটির প্রথম অধিবেশন বসে। কমিটি কর্তৃক প্রনীত ১৫৩ অনুচ্ছেদ বিশিষ্ট ৯১ পৃষ্ঠা একটি খসড়া শাসনতন্ত্র ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গৃহীত হয় এবং ১৪ ডিসেম্বর গণপরিষদের ৩৫৭ আসন সদস্যের স্বাক্ষরসহ স্পীকার তা অনুমোদন করেন।

শাসনতন্ত্রে জনগণের মৌলিক অধিকার সহ নাগরিক অধিকারসমূহ শর্তহীনভাবে উল্লেখিত থাকার ব্যাপারে ভাসানী আগা-গোড়াই মুখর ছিলেন। ১৯৭২ সালের ১৪ এপ্রিল সন্তোষে ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়- "সংবিধান হবে ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক। সকল ধর্মমতের অনুসারী বাঙ্গালী অবাঙ্গালী নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ যাতে আইনের দৃষ্টিতে সমান অধিকার পায়, সে জন্যে শাসনতন্ত্রে নিশ্চয়তা থাকতে হবে।"

সভায় গণপরিষদে বিবেচনার জন্য ন্যাপের পক্ষ থেকে জাতীয় সংবিধান প্রণয়নের জন্যে মওলানা ভাসানীকে আহ্বান করে একটি সাব-কমিটি গঠন হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন হাজী মোহাম্মদ দানেশ আলী। সফদার খান, রাশেদ খান মেনন, শান্তি সেন ও মাহবুব উল্লাহ। এছাড়া ড. আলীম আল রাজীসহ তিনজন শাসনতন্ত্র বিশেষজ্ঞকেও কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

শাসনতন্ত্রের মতো একটি স্থায়ী এবং সকল জনগনের স্বার্থরক্ষাকারী অতি জরুরী একটি দলিল যাতে দলীয়ভাবে রচিত না হয়-সে ব্যাপারে ভাসানী সরকারের উপর চাপ দেন। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর শাসনতন্ত্র কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

সরকার ১৯৭০ সালে নির্বাচিত গণপরিষদ ভেঙ্গে দেয় এবং ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। এই সময় ভাসানীর নেতৃত্বে একটি ৭-দলীয় নির্বাচনী জোট গঠিত হয়। ন্যাপ (ভাসানী), বাংলাদেশ জাতীয় লীগ (আতাউর রহমান খান), বাংলাদেশ জাতীয় লীগ (অলি আহাদ), শ্রমিক কৃষক সমাজ বাদী দল, বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (হাতিয়া) প্রভৃতি দলের সমন্বয়ে। ১৯৭২ সালের ৩১ ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় ভাসানী ঘোষণা করেন যে, নির্বাচনের মাধ্যমেই সরকারের পতন ঘটাতে হবে। নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার জন্য সরকারের পদত্যাগ দাবি করেন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনে, জাসদ ২৩৭ আসনে, ন্যাপ (মোজাফ্ফর) ২২৪ আসনে, ন্যাপ (ভাসানী) ১৭০ আসনে, সিপিবি ৪ আসনে এবং অন্য ছোট দলগুলো কিছু আসনে প্রার্থী দেয়।

একজন প্রার্থীর মৃত্যুতে ২৮৮ টি আসনে নির্বাচন হয়। তার মধ্যে আওয়ামী লীগ ২১ টি আসনে জয়লাভ করে । ১১টিতে তাঁরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়লাভ করে । মোট ২৯২ টি আসন তারা পায়। বাদবাকী সাতটি আসন পান আতাউর রহমান খান, আব্দুস সাত্তার (জাসদ), আব্দুল্লাহ সরকার (জাসদ), নির্দলীয় আলী আশরাফ, সৈয়দ কামরুল ইসলাম মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন, চাউ খোয়াই রোয়াজা এবং মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা নির্বাচনে জয়লাভ করেন।
নির্বাচনের পরদিন বিরোধী শিবির থেকে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ আনা হয়। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, “বাংলাদেশে কোনো বিরোধী দল নেই।” অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহম্মেদ ও পংকজ ভট্টাচার্য নির্বাচনকে প্রহসন আখ্যা দিয়ে বলেন, ‘অন্তত ৭০ আসনে বিরোধী দলের বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো।’
নির্বাচনের বেশ কিছুদিন আগে ২৮ ফেব্রুয়ারী থেকে ভাসানী অসুস্থ অবস্থায় পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।
১৯৭৩ সালের ২৬-২৭ মার্চ ঢাকার ন্যাপের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয় ভাসানীর সভাপতিত্বে এবং সরকারের অগণতান্ত্রিক রীতিনীতির কঠোর সমলোচনা করেন। সাধারণ নির্বাচনে সরকারের ভুমিকার নিন্দা করে তিনি

Dhaka University Institutional Repository

সরকারকে সতর্ক করে দেন। ২৯শে এপ্রিল সারাদেশে শোভাযাত্রা বিক্ষোভের মাধ্যমে 'দাবি দিবস' পালনের ডাক দেয়া হয়।

সারাদেশে সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের উপর দমন-পীড়ন ব্যাপক ভাবে চলতে থাকে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। দেশের শিল্পাঞ্চলগুলোতেও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে -যা জাতীয় অর্থনীতিতে অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। এমতাবস্থায় ১৯৭৩ সালের ৭মে ভাসানী এক বিবৃতিতে বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে সরকার সমর্থিত শ্রমিক সংগঠন, প্রশাসন, পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর সন্ত্রাস সৃষ্টি, জুলুম-অত্যাচার ও লুটপাট বন্ধের আহ্বান জানান। স্বাধীনতার পর থেকেই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ, দমন-পীড়ন বন্ধ ও খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য শত আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও মওলানা ভাসানী পারেননি এসব বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি ফেরাতে। তারা নিজেদের নিয়েই ব্যাস্ত থাকলেন। অথচ দেশ যে দ্রুত গতিতে দুর্ভিক্ষের দিকে ধাবিতে হচ্ছিলো সেটা আমলেই নেয়নি সরকার। নির্বাচনের পরে সরকারের ও আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের স্বৈরতান্ত্রিক আচরণ অধিক মাত্রায় বেড়ে যায়।

১৯৭৩ সালের ৫ মে সন্তোষে অনুষ্ঠিত ন্যাপের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি প্রতিরোধ আন্দোলনের এক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় এবং ভাসানী ঘোষনা দেন যে-১৫ মে হতে ঢাকায় ন্যাপ অফিসে সকলের জন্য খাদ্যের দাবিতে' তিনি আমরণ অনশন শুরু করবেন। সেই সাথে সারাদেশে বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের উপর ব্যাপক দমন-পীড়ন, গুম, খুন ও গুপ্ত হত্যাসহ বিভিন্ন ধরনের হয়রানি বন্ধের দাবি জানানো হয়।

১৯৭৩ সালের ১৪ মে ঢাকায় পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ভাসানী বলেন-৩ দফা দাবির ভিত্তিতে তিনি আমরণ অনশন শুরু করবেন। দাবিগুলো হচ্ছে, (১) খাদ্য, বস্ত্র ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য হ্রাস, (২) রাজনৈতিক নেতা কর্মী ও জনগনের উপর দমন-পীড়ন বন্ধ করা এবং (৩) শিল্প, ব্যবসা, চাকরি ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে অরাজকতার অবসান ও জানমালের নিরাপত্তা বিধান।

Dhaka University Institutional Repository

ভাসানীর এই অনশনের ফলে ন্যাপ কিছুটা সংগঠিত হওয়ার সুযোগ পায়। বিরোধী দলীয় আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। জনগনের সামনে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দলীয় সরকারের চরিত্রও হয় উন্মোচিত। জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের মাত্র আটজন সদস্য থাকায় সেখানে তেমন ভুমিকা রাখার সুযোগ ছিলো না তাই রাজপথে আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। ভাসানীর অনশনের কয়েক মাসের মধ্যেই দেশে দেখা দেয় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ-যা "চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ" নামে খ্যাত।

১৯৭৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোজাফ্ফর) এবং সিপিবি-র সমন্বয়ে গঠিত হয় ত্রিদলীয় ঐক্যজোট। তাতে ছিলো ন্যাপ (ভাসানী), বাংলাদেশ জাতীয় লীগ (আতাউর রহমান খান), বাংলা জাতীয় লীগ (অলি আহাদ), জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন (হাজি দানেশ), কৃষক শ্রমিক সমাজবাদী (খান সাইফুর রহমান), বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি (নাসিম আলী) এবং বাংলাদেশে কমিউনিষ্ট পার্টি (মোস্তফা জামাল, হায়দার আকরব খান রনো)। ভাসানীর নেতৃত্বে এই জোট ৪-দফা জনদাবির ভিত্তিতে আন্দোলন শুরু করে।

জোটের উদ্যোগে ১৯৭৩ সালের ২৩ এপ্রিল পল্টন ময়দানে ভাসানীর সভাপতিত্বে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। মুজিবের নেতৃত্বে সরকারী ত্রি-দলীয় জোট এবং ভাসানীর নেতৃত্বে বিরোধী ঐক্যজোটের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমেই সংঘাতময় হয়ে ওঠে। বিবৃতি ও পালটা বিবৃতিতে পরস্পরকে আক্রমণ করা চলতে থাকে। ক্রমে রাজনীতি হয়ে ওঠে সংঘাতের।

১৯৭৪ সালের ৮ এপ্রিল সন্তোষে তিনি এক সম্মেলন ডেকে সেখানে গঠন করেন 'হুকুমতে রব্বানিয়া সমিতি'। এই সমিতিকে একটি ইসলামী ও সাম্প্রদায়িক সংগঠন বলে মনে হলেও, আসলে তিনি এটাকে দিতে চেয়েছিলেন এক ধর্মনিরপেক্ষ রূপ। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানবজাতির মঙ্গল বিধানই ছিলো এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

৭৪-এর দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি ইতিমধ্যে শোনা যাচ্ছিলো। ভাসানী দেশের বিভিন্ন এলাকা সফর করে সভা-সমাবেশের মাধ্যমে সরকারকে এ ব্যাপারে হুশিয়ার করে দিচ্ছিলেন। ১৯৭৪ সালের ৮ এপ্রিল নবগঠিত 'হুকুমতে রব্বনিয়া সমিতি' আয়োজিত বিশাল জনসভায় বেদনা ভারাক্রন্ত কণ্ঠে ভাসানী বলেন-

Dhaka University Institutional Repository

"বাচাঁও। মানুষ বাঁচাও, আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ বাঁচাও। এই প্রশ্নে ভেদাভেদ ভুলিয়া যাও। অনাহারে মৃত্যুর খবর আজ কোন নতুন খবর নহে। কোলের শিশু বিক্রয় করিয়া দিবার সংবাদ অপ্রত্যাশিত কিছু নহে। আল্লাহ্ বান্দাদের, এতো সাধের সৃষ্টি কিভাবে দিন কাটাইতেছে। হে দেশবাসী, হে অথর্ব সরকার। রেষারেষি ভুলিয়া যাও। মানুষ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও। যে সংকট দেখা দিয়াছে, মুজিব তোমার মোকাবিলা করিবার ক্ষমতা নাই। সকল রাজবন্দীকে মুক্ত করিয়া দাও, হুলিয়া প্রত্যাহার করো। সবাইকে লইয়া বসো, আমিও বসিবো। মানুষ বাঁচানোর কাজে সকল শক্তি নিয়োগ করো।"[১] ব্যথাতুর জননেতার সেদিন কি আকুল আবেদন।

তার কিছুদিনের মধ্যেই দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অতীতের দুর্ভিক্ষের সময়েও দেশে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুত ছিলো বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত দিয়েছেন।

ভাসানী যখন প্রকাশ্যে ভারত সরকার ও ভারতীয় অসাধু ব্যবাসায়ীদের কঠোর সমালোচন করেন, তাঁর এই সমালোচনাকে আওয়ামী লীগসহ সুবিধাবাদী স্বার্থান্বেষী মহল সাম্প্রদায়িকতা' বলে আখ্যা দেয়। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও তাদের অনুগামী মস্কোপন্থী তথাকথিত প্রগতিশীল দলগুলোর নেতারা ভাসানীকে সাম্প্রদায়িকতার প্রবক্তা বলে অন্যায় আখ্যা দেন। যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তিনি সারাটা জীবন লড়েছেন, প্রতিপক্ষ কুচক্রী আওয়ামী লীগ মহল তাঁকেই সাম্প্রদায়িক বানানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়।

কিন্তু তিনি আওয়ামী লীগ সরকারের নানা গণবিরোধী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। কিন্তু তাদের ৪টি মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিপেক্ষতা- এসবের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। তিনি এও বলেছেন-"এগুলো শুধু সংবিধানে লিখে রাখলে চলবে না, এসব নীতির অনুশীলন ও বাস্তব প্রয়োগ চাই।"

সুবিধাবাদী আওয়ামী লীগ চক্র তাদের রাজনৈতিক সুবিধা লুটার জন্য ভাসানীর ভারত সরকার ও ভারতীয় মাড়োয়াড়ি ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে সমালোচনাকে সাম্প্রদায়িকতার লেবেল এঁটে দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়।

(১) সৈয়দ আবুল মকসুদ-মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, বাংলা একাডেমী ১৯৯৪

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর বিরুদ্ধে এসব সমালোচনার উত্তরে ১৯৭৪ সালের ৭ মে ময়মনসিংহে এক জনসভায় ভাসানী বলেন-"মুজিব তুমি জেনে রাখো, মস্কোপন্থীরা নয় বরং বুড়ো ভাসানীই তোমার বন্ধু। ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী অটুট রাখতেই আমি অসাধ্য এবং শোষক মাড়োয়াড়ির বিরুদ্ধে কথা বলছি। তাঁকে সাম্প্রদায়িকতার প্রবক্তা' আখ্যা দেয়ার জবাবে তিনি বলেন, ইসলামের শত্রু ঘোষনা করে পাকিস্তান সরকার আমাকে জেলে রেখেছে। আমার অসাম্প্রদায়িক ভূমিকার দরুন ওরা আমাকে ভারতের দালাল বলেছে। জীবনে কতো গালি শুনেছি। আর আজ আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো হচ্ছে আমি সাম্প্রদায়িক, অথচ আমি যখন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট ছিলাম পাঁচজন হিন্দু-মনোরঞ্জন ধর, ধীরেন দত্ত, বসন্তকুমার দাস এবং জনৈক সুত্রধরকে মন্ত্রী করেছিলাম।"[১]

এক বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন-"আমি নতুন দেশপ্রেমিক বা দেশদরদী হই নাই। ৫৬ বৎসর পুর্বে যাহা ছিলাম আজো তাহাই আছি। আমার মত ও পথের পরিবর্তন করি নাই। যাহারা আমার ঘাড়ে সওয়ার হইয়া অনেক কিছু বানাইয়াছে তাহাদের মত ও পথ অনবরত পরিবর্তিত হইয়াছে।

এই সময়ে মওলানা ভাসানী কর্তৃক প্রকাশিত সাপ্তাহিক হক কথা সরকারের অগণতান্ত্রিক নীতি ও ভারতীয় আধিপত্যবাদের কঠোর সমালোচনা করে আসছিলো। জনসাধারণের মধ্যে হক কথা দারুণ প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। সরকার ক্রমান্বয়েই স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে এবং অসহিষ্ণু হয়ে মওলানা ভাসানীর ব্যক্তিগত সচিব ও সাপ্তাহিক হক কথা'র সম্পাদক সৈয়দ ইরফানুল বারীকে গ্রেফতার করে। ১৯৭২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর সরকার হক কথা'র প্রকাশনাও নিষিদ্ধ ঘোষনা করে।

একদিকে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ব্যাপক চোরাচালান, মজুদদারী ও সমাজবিরোধীদের বেপোরোয়া দৌরাত্ম- অন্যদিকে দুর্নীতি ও সরকারী নিপীড়নের ব্যাপকতায় ১৯৭৪ সাল নাগাদ দেশে এক গুরুতর অরাজক পরিস্থিতি বিরাজ করছিলো। সরকার ও তার প্রশাসনযন্ত্রের উপর মানুষের আস্থা নষ্ট হয়ে যায়। দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ হয়ে পড়ে একেবারেই প্রধানমন্ত্রী ও তার সরকারের হুকুম তামিল করার সংস্থায়।

(১) সৈয়দ আবুল মকসুদ-মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, বাংলা একাডেমী ১৯৯৪

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৪ সালের প্রথম দিকে ভাসানীর নেতৃত্বে-জাতীয় লীগ (আতাউর রহমান খান), জাতীয় লীগ (অলি আহাদ), জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন (হাজী দানেশ), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিন বাদী) এবং বাংলাদেশ শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দল- এই ৬টি দলের সমম্বয়ে 'সর্বদলীয় ঐক্যফ্রন্ট' গঠিত হয়। তাঁদের রচিত ৪-দফা দাবির ভিত্তিতে ভাসানীর নেতৃত্বে এই ফ্রন্ট নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ডাক দেয়।

১৯৭৪ সালের ১৬ মে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান নতুন দিল্লিতে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের ভূখন্ড 'বেরুবাড়ি ছিট মহল' ভারতকে দিয়ে দেয়া হয় কঠোর ভাষায় এর প্রতিবাদ করেন ভাসানী।

এই সময়ে সরকার দেশের বিভিন্ন স্থানে সভা-শোভাযাত্রা বন্ধের উদ্দেশ্যে ১৪৪ ধারা জারি করে। ৩০ শে জুন ঐক্যফ্রন্ট পল্টন ময়দানে এক জনসভা করার ঘোষণা দেয়। ২৯ মে ১৪৪ ধারা জারির প্রতিবাদে ন্যাপ ঢাকায় একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করে। পুলিশ মিছিলে লাঠিচার্জ করে ও কয়েকজনকে গ্রেফতার করে। ৩০ জুন সকার থেকেই রক্ষীবাহিনী মোতায়েন করা হয় পল্টন ময়দানে। সময়মতো ঐক্যফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ সভাস্থলে উপস্থিত হলে সভা পন্ড করে দেয়া হয় ও অলি আহাদকে গ্রেফতার করা হয়। ঐদিন সুর্য উঠার আগেই ঢাকার মশিয়ুর রহমানের বাসা থেকে ভাসানীকে গ্রেফতার করে পুলিশ তাঁকে সন্তোষেই নিয়ে যায়। সেখানে তাকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়। তারপর ১৯৭৪ সালের ৩০ জুন হতে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের পট পরিবর্তন পর্যন্ত ভাসানী সন্তোষে নজরবন্দী থাকেন। তবে নজরবন্দী থেকেই তিনি বিবৃতির মাধ্যমে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য তাঁর সহকর্মী ও দেশবাসীর প্রতি বার বার আহ্বান জানান।

১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি এক অধ্যাদেশ দ্বারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন- যার বলে শাসনতন্ত্রে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখা হয় তারপর এক মাসের মধ্যেই সংবিধানের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন করে এক সংশোধনী আনা হয়- যা 'চতুর্থ সংশোধনী' বলে কুখ্যাত । ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী কোনো আলোচনা ছাড়াই বিলটি উত্থাপনের মাত্র এক ঘন্টার মধ্যেই তা পাশ করা হয় শেখ মুজিবুর রহমানের রাবারস্ট্যাম্প পার্লামেন্টে সংসদীয় পদ্ধতির সংবিধান রূপান্তরিত হয়

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার পদ্ধতিতে। মোহাম্মদ উল্লাহর পরিবর্তে শেখ মুজিবুর রহমান নতুন রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন। পুরো প্রশাসনিক কাঠামোতেই পরিবর্তন আনা হয়। উপরাষ্টপতি নিযুক্ত হন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, আর প্রধানমন্ত্রী হন মনসুর আলী। নির্বাহী বা শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইন সভার চরিত্র সম্পূর্ন বদলে যায়। দেশের সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয়, সেই সঙ্গে রাজনৈতিক তৎপরতার উপরও আরোপ করা হয় নিষেধাজ্ঞা। ১১৭-ক ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে রাষ্ট্রপতি একটি 'জাতীয় দল'- 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' সংক্ষেপে 'বাকশাল' গঠন করেন, ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের প্রথম প্রহরে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান এক সামরিক অভ্যুত্থানে স্বপরিবারে নিহত হন। এই নৃশংস হত্যাকান্ডের কয়েক ঘন্টা পরেই সকালে শেখ মুজিবের বাকশাল এর নেতা সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল কে এম শফিউল্লাহ, বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শল একে খন্দকার এবং নৌবাহিনীর প্রধান কমাণ্ডার এমএইচ খান পৃথক পৃথক বেতার ভাষনে অভ্যুত্থানের নেপথ্য নায়ক খন্দকার মোশতাক আহমদ-এর নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ দিনের সহযোগী আওয়ামী লীগ নেতা খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি হিসেবে ওইদিন বিকালে শপথ গ্রহন করেন। এ ঘটনা শোনার পর সন্তোষে স্তম্ভিত হয়ে যান মওলানা। অশ্রুসিক্ত দু'নয়নে বলেন, 'সব শেষ হয়ে গেলো'।

মোশতাকের নির্দেশে জেনারেল ওসমানী হেলিকপ্টার করে ১৬ আগস্ট সন্তোষে গিয়ে ভাসানীকে সব ঘটনা অবহিত করেন। ওসমানীর পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও সেদিন ভাসানী কোনো বিবৃতি দিতে অস্বীকৃতি জানান। ২১ আগস্ট মোশতাক নিজে ভাসানীর সঙ্গে দেখা করতে যান, তিনি মোশতাককেও ফিরিয়ে দেন।

১২ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট সায়েম ও সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের অনুরোধে আতাউর রহমান খান ও ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন সন্তোষে যান জাতীর এই ক্রান্তিলগ্নে ভাসানীকে দিয়ে একটি বিবৃতি দেয়ানোর প্রস্তাব নিয়ে। রেকর্ডে ধারণকৃত ভাসানীর বিবৃতিটি ওইদিনই বেতারে প্রচার করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেন–"বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নস্যাৎ করিবার সাম্প্রতিক একটি সুগভীর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করা হইয়াছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, বাংলাদেশে নগন্য সংখ্যক মীরজাফরকে অবলম্বন করিয়া এখনও দেশী-বিদেশী শক্তি আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে খানচাল করিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে।প্রতিরক্ষা বাহিনীর অভ্যন্তরে কোন্দল ও ভূল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করিতে শত্রুমহল উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের কার্যক্রমকে সাফল্যমন্ডিত করিতে আজ তাই দলমত নির্বিশেষে এই সরকারের প্রতি সকলের সার্বিক সহযোগিতা একন্ত প্রয়োজন।"[১]

এমনিভাবে জাতির সকল ক্রান্তিলগ্নে সকল ক্ষমতাধররাই জনগণের নেতা ভাসানীর নিকট ছুটে যেতেন। তাই জিয়াউর রহমানও উপলদ্ধি করতে পারলেন সিআইএ ও 'র'- এর মাধ্যমে আমেরিকা ও ভারত বাংলাদেশকে নিয়ে যে খেলা খেলছে সে খেলায় শেখ মুজিবুর রহমানের মতো রাজনীতিকই অস্তিত্ব হারিয়েছেন, জিয়াউর রহমান নিজে সে খেলার একজন গুঁটি মাত্র। নতুন উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলা করার কোনো যোগ্যতা তাঁর নাই। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে হলে দেশের একজনই নেতা আছেন-যার ডাকে জনগণ সাড়া দেবে, আন্তর্জাতিক কুচক্রীরাও নিবৃত্ত হবে আপাততঃ। তাই ধর্না দেন জনগণের নেতা মওলানা ভাসানীর নিকট। এমনিভাবে সকলের কাছেই তিনি ছিলেন রাজনৈতিক অবতার।

১৯৭৬ সালের ১৫ জানুয়ারী অসুস্থতার কারণে তিনি পিজি হাসপাতলে ভর্তি হন। এই সময়ে জিয়াউর রহমান তাঁকে দেখতে গেলে তিনি বলেন-"জনগনের কাছে যাও। লোকের দুঃখ-দুর্দশা দেখো। সায়েমের মতো বঙ্গভবনে বসে থেকো না।" তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে সমালোচনা করতেও জিয়াকে নিষেধ করেন। এটাইতো প্রমান করে যে, ভাসানীর বিশাল নেতৃত্বের স্নেহজালে মুজিব ছিলেন আটকে। ভাসানীর বৈরী রাজনীতির প্রতিভূ হিসেবে মুজিব বহুদূরে চলে গেলেও তাঁর এককালের সহকর্মী হিসেবে ভাসানী তাঁকে কোনোদিন বঞ্চিত করেননি স্নেহ থেকে।

(১) মজলুম জননেতা-মওলানা ভাসানী স্মারক সংকলন পৃষ্ঠা - ৩৪২

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৬ সালের ৭ ডিসেম্বর সন্তোষের কৃষক সম্মেলনে ভাসানী বলেন-"৭ নভেম্বরের বিপ্লবের প্রতি বাংলার আপামর গণমানুষের স্বতস্ফুর্ত সমর্থন এবং সক্রিয় একাত্মতা প্রকাশ বিগত বছরগুলির রাজনীতি, রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট রায় ঘোষনার শামিল। জাতীয় স্বাধীনতা ও শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এদেশের মানুষ বিগত কয়েক যুগ ধরিয়া বিরামহীন সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছে।"

ক্ষমতার বাইরে থেকেও সেই সময়ে চিকিৎসকদের নিষেধ অমান্য করে অসুস্থ শরীরে ভাসানী দেশের মর্যাদা, সার্বভৌমত্ব, শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় অবিশ্রান্তভাবে কাজ করে যান। ১৯৭৫ সালের পট পরিবর্তনের পর বাংলাদেশে মৌলবাদী ও পাকিস্ত ানপন্থীদের পুনরুত্থান ঘটে। ১৯৭৬ সালের ৭ মার্চ এইসব পাকিস্তানপন্থীদের উদ্যোগে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত 'সিরাতুন্নবী' উপলক্ষে এক সম্মেলনে তোয়াব প্রধান অতিথির ভাষণে নানা রকম ক্ষতিকর রাজনৈতিক বক্তব্য দেন-দেশের নাম, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তন করার ধৃষ্টতাপূর্ন কথাও বলেন।

এসব তৎপরতার প্রতিবাদে ১৯৭৬ সালের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এক বাণীতে ভাসানী-পাকিস্থানপন্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন– "পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কোনো দেশে কোনো ধর্মানুষ্ঠানে অথবা নিজ নিজ ধর্মীয় কার্যকলাপে ভিন্ন কোনো দেশের নামে শ্লোগান দেয়া হয়েছে বলে শোনা যায় নাই।"[১] তিনি বলেন, ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে রাজনীতির মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করে জনগণকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।

পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ভাসানী ১৭ মার্চ নিজের হাতে লেখা এক বিবৃতিতে বলেন,"বাংলাদেশ যখন এক সংকটময় মুহুর্তের মধ্যদিয়া অতিক্রম করিতেছে ঠিক সেই মুহূর্তে এক শ্রেনীর প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিকচক্র সাম্প্রদায়িক ও চরম দেশদ্রোহিতামুলক বক্তব্য ও কর্মপদ্ধতি সামনে রাখিয়া বাংলাদেশের রাজনীতির মাঠে নামিবার পাঁয়তারা করিতেছেন।"[২] মওলানা ভাসানীর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের সর্বশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা হচ্ছে 'ফারাক্কা লং মার্চ' সংগঠিত করা।

(১) মজলুম জননেতা-মওলানা ভাসানী স্মারক সংকলন পৃষ্ঠা - ৩৪৪

(২) মজলুম জননেতা-মওলানা ভাসানী স্মারক সংকলন পৃষ্ঠা - ৩৪৫

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষার কারণ দেখিয়ে ভারত সরকার আর্ন্তজাতিক নদী গঙ্গায় বাঁধ দিয়ে একতরফা ভাবে পানি প্রত্যাহার করায় বাংলাদেশের পরিবেশ ও অর্থনীতির উপর খুব বিরূপ প্রভাব ফেলে। ১৯৭৪ সাল থেকেই ভারত কর্তৃক গঙ্গার এই অন্যায় পানি প্রত্যাহারের প্রতিবাদ করেন ভাসানী, তিনি উভয় দেশের সরকারের প্রতি আবেদন জানান বার বার এই সমস্যা সমাধান করার। ১৯৭৬ সালের ১৮ এপ্রিল হাসপাতল থেকে মুক্তি পেয়েই তিনি ঘোষনা দেন যে, যদি ভারত বাংলাদেশের ন্যায্য পাওনা পানি না দেয়, তাহলে ১৬ মে রাজশাহী থেকে লক্ষ জনতার শান্তি মিছিল ফারাক্কা অভিমুখে যাত্রা শুরু করবে। তিনি বলেন, " ভারতের ষাটকোটি জনগণের কাছে আমরা বিচার চাইব।"

মওলানা ভাসানীকে প্রধান করে ১৯৭৬ সালের ২ মে ৩১ সদস্যবিশিষ্ট 'ফারাক্কা' মিছিল পরিচালনা জাতীয় কমিটি' গঠিত হয়, পরে এই কমিটির সদস্য সংখ্যা ৭২-এ উন্নীত হয়। এপ্রিল থেকে তাঁর শরীর খারাপ হচ্ছিলো তা সত্ত্বেও ফারাক্কা ও সীমান্তে গোলযোগের ব্যাপারে কাজ করে যান। ১৮ এপ্রিল তিনি সার্বিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে ইন্দিরা গান্ধীকে একখানা চিঠি দেন এবং তাতে বলেন যে, ফারাক্কা সমস্যা সমাধানের যদি তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা না করেন, তবে তাঁর লং মার্চ-এর কর্মসূচি অপরিবর্তিত থাকবে। তিনি ভারতের বন্ধুত্ব কামনা করেন এবং ভারতের কাছ থেকেও একই ধরনের আচরণ আশা করেন।

১৯৭৬ সালের ২৮ এপ্রিল এক বিবৃতিতে তিনি ফারাক্কা লং মার্চ-এ অংশ নেয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। ফারাক্কা বাংলাদেশের মানুষের উপর যে কতোটা ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে তাও তিনি উল্লেখ করেন।

১৯৭৬ সালের ১৬ মে ভাসানীর ডাকে সাড়া দিয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাজশাহী শহরে এসে সমবেত হয়। তিনি ঘোষণা করেছিরেন যে, লং মার্চ এর মিছিল রাজশাহী থেকে প্রেমতলী, প্রেমতলী থেকে চাঁপাই নবাবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ থেকে মনকষা, আর মনকষা থেকে শিবগঞ্জ পর্যন্ত চৌষট্টি মাইল পথ অতিক্রম করবে। লং মার্চ শুরু করার আগে রাজশাহীর মাদরাসা ময়দানে এক জনসমুদ্রে তিনি ঘোষনা দেন-"গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে। আমরা শান্তি চাই, আর তারা যুদ্ধ চায়। বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনতার

Dhaka University Institutional Repository

ভয়ে তারা সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করেছে। আমরা যুদ্ধকে ঘৃণা করি।" তিনি আরও বলেন, "এই মিছিল বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে মজলুমের সংগ্রামের প্রতীক। গোটা বিশ্বের বুক থেকে জালেমের শোষন-পীড়নের সমাপ্তি না ঘটা পর্যন্ত এ সংগ্রাম চলব।"[১]

মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে এই প্রতীকী প্রতিবাদ দেশী-বিদেশী সংবাদ মাধ্যমগুলোতে ব্যাপক প্রচার পায়। ভাসানীর উদ্দেশ্য ছিলো বাংলাদেশের এই গুরুতর সমস্যাটির প্রতি দেশের জনগন, ভারতের জনগন,ও সরকার এবং বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষন করা। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়।

ফারাক্কা লং মার্চের পর থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে ১৯৭৬ সালের ২৭ মে সন্তোষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাসানী বলেন, "স্বাধীনতার পর থকে এ পর্যন্ত দেশে কতো গুপ্তহত্যা সংঘটিত হয়েছে, লুট হয়েছে কতো ব্যাংক ও ধন সম্পত্তি তা নির্নয়ের উদ্দেশ্যে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে।" আর তারপর দিনই তিনি অসুস্থ হয়ে পিজি হাসপাতালে ভর্তি হন। কয়েকদিন পর সুস্থ হয়ে ফিরে যান সন্তোষ।

পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি না ঘটলে ১৪ আগষ্ট তাঁকে চিকিৎসার জন্য লন্ডনে পাঠানো হয়। যাত্রার প্রাক্কালে এক বিবৃতিতে আশাা প্রকাশ করেন যে, আরোগ্য লাভের পর তিনি পুনরায় জনগনের অধিকার ও তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করবেন।

১৫ আগষ্ট তাঁকে লন্ডনের সেন্ট পিটার্স হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১৭ আগস্ট তাঁর মূত্র গ্রন্থিতে অস্ত্রোপাচার করা হয়। সার্জন প্রফেসর পিটার আর রিভল সাংবাদিকদের বলেন, 'সবকিছু ঠিক আছে, তিনি দ্রুত আরোগ্য লাভ করেবেন।' ২৭ আগস্ট হাসপাতাল থেকে মুক্তি পেয়ে কেনসিংটন এলাকায় একটি এপার্টমেন্টে অবস্থান নেন। লন্ডনে অবস্থানকালীন একাধিকবার চীনের রাষ্ট্রদূত তাঁর সাথে দেখা করে চীন সফরের আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু ভাসানী আমন্ত্রণ গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেন।

(১) মজলুম জননেতা-মওলানা ভাসানী স্মারক সংকলন পৃষ্ঠা - ৩৪৫

Dhaka University Institutional Repository

১১ সেপ্টেম্বর বাঙ্গালিরা কর্নওয়ে হলে তাঁকে এক সংবর্ধনা দেয়। ১২ সেপ্টেম্বরে তিনি ঢাকায় ফিরে বিমানবন্দরে থেকে সরাসরি সন্তোষে চলে যান।

১৯৭৬ সালের ২ অক্টোবর সন্তোষে 'খোদা-ই-খিদমতগার' নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠানের নাম ঘোষনা করেন তিনি। নিজে তার আহবায়ক হন এর উদ্দেশ্যে 'জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব' সুসংহত করা।

২৫ অক্টোবর বাংলাদেশকে সাহায্য করার জন্য তাকে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠার জন্য সুযোগ দানের আবেদন জানান বিশ্ববাসীর কাছে।

২৬ অক্টোবর সন্তোষ থেকে আরেক বিবৃতিতে বলেন-"সংসদীয় রাজনীতির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই। দেশের বর্তমান সন্ধিক্ষণে নির্বাচন ও নির্বাচনের রাজনীতি সম্পর্কে আমার ধারণা কি তাহা আপনারা জানেন। আমার বিশ্বাস, নির্বাচন ও ক্ষমতার রাজনীতিতে অংশগ্রহন না করিয়াও দেশ জাতির সেবা করা যায়।"[১]

৪ নভেম্বর শ্বাস- প্রশ্বাসজনিত রোগে আক্রান্ত হলে তাঁকে পুনরায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ৭ নবেম্বর ভাসানী জীবনের শেষ সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষন দেন। তিনি বলেন- "যখন দেশের ভিতরে বিদেশী দালালরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপপ্রয়াসে লিপ্ত, তখন নির্বাচনসহ বিভিন্ন প্রশ্নে সরকারের দোদুল্যমানতা দেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।" [২]

১৩ নভেম্বর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের দু-জন ডাক্তারসহ তিনি সন্তোষে পৌঁছেন। ওইদিন 'খোদা-ই-খিদমতগার'-এর প্রথম সম্মেলনে লিখিত ভাষণ দেন। তিনি উপস্থিত বক্তৃতাও করেন সেখানে। ওই দিন তিনি আবার ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন।

১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সন্ধ্যার পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে সারা দেশে শোকের ছায়া নেমে আসে।

(১) মজলুম জননেতা-মওলানা ভাসানী স্মারক সংকলন পৃষ্ঠা - ৩৪৭

(২) মজলুম জননেতা-মওলানা ভাসানী স্মারক সংকলন পৃষ্ঠা - ৩৪৮

Dhaka University Institutional Repository

পরদিন ইত্তেফাক এক প্রতিবেদনে লেখে, "মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী আর নাই। বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের রাজনৈতিক নভোমন্ডল হইতে এই উজ্জ্বল জ্যোতিস্কের কক্ষচ্যুতি ঘটিয়াছে। গতকাল (বুধবার) রাত্রি আটটা বিশ মিনিটে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ৯ নম্বর কেবিনে।"[১]

১৯ নভেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক 'একটি শতাব্দীর মৃত্যু' শিরোনামে সম্পাদকীয়তে লেখে-"শতাব্দীর সূর্য অস্তমিত হইল। উপমাহাদেশের রাজনৈতিক গগনের জ্যোতিষ্মান নক্ষত্র, মজলুম জনগনের অবিসংবাদিত নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী দীর্ঘ রোগ ভোগের পর কোটি কোটি মানুষকে শোক সাগরে ভাসাইয়া গত পরশু উত্তীর্ণ সন্ধ্যায় লোকান্তরে অন্তর্হিত হইলেন। তাহার মহা প্রয়াণের ভিতর দিয়া শতাব্দীর এক বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসের পতন ঘটিলো। অন্য কাহারো দ্বারা তাঁহার শূণ্য বেদী পূর্ণ হইবার নয়।"[২]
এমনিভাবে মওলানা ভাসানীর, মৃত্যুর মধ্যদিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় বাঙ্গালী জাতির আন্দোলন সংগ্রামের প্রায় এক শতাব্দীর প্লিবী কণ্ঠস্বর। এদেশের কৃষক, শ্রমিক, জেলে, তাঁতী, কামার, কুমার এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মেহনতি জনগণ হারিয়ে ফেলে তাদের জাতিসত্তা ও জাতীয়তাবাদের উদগাতা পুরুষকে। সাম্রজ্যবাদের জাত শত্রু, সামন্তবাদের আতঙ্কে এবং শাসক ও শোষক শ্রেণীর বিষফোঁড় মওলানা ভাসানীর মৃত্যুতে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার শোষিত-নির্যাতিত মানবগোষ্ঠী হারায় তাদের মুক্তির সংগ্রামে সমর্থন ও অনুপ্রেরণাদনকারী বিশ্বের প্রথম সারির একজন জননায়কের সোচ্চার কণ্ঠস্বর।

(১) মজলুম জননেতা-মওলানা ভাসানী স্মারক সংকলন পৃষ্ঠা -৩৪৮

(২) মজলুম জননেতা-মওলানা ভাসানী স্মারক সংকলন পৃষ্ঠা - ৩৪৮

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় - ৬

মওলানা ভাসানীর দর্শন।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা ভাসানী স্বীয় রাজনৈতিক মতাদর্শ কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে যাননি। সমসাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে কিছু পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন এবং জীবনের শেষ পর্যায়ে “হক কথা” নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকাবলীর মধ্যে রয়েছে দেশের সমস্যা ও সমাধান (১৯৬২)। পাঁচটি প্রবন্ধ (১৯৭২) রবুবিয়াতের ভুমিকা (১৯৭৪) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন ও কাঠামো (১৯৮৭) ইত্যাদি। তাহা ছাড়া তাঁহার দীর্ঘ জীবনে প্রদত্ত অসংখ্য ভাষণ ও বিবৃতিতেও তাঁহার মতাদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়।

মহাত্মা গান্ধী। আচার্য বিনোবা ভাবে এবং সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রচলিত অর্থে রাজনৈতিক নেতা বলতে যা বোঝায় তা ছিলেন না, তার উর্ধ্বে ছিলো। তাঁদের অবস্থান । যদিও রাজনীতিই ছিলো তাঁদের জীবনের প্রধান কর্মক্ষেত্র, দলের গন্ডিনয়, শোষিত নিপীড়িত মানুষের বিচরণের যে বিস্তীর্ন প্রান্তর সেখানেই ছিলো তাদের উপস্থিতি। উপমহাদেশের রাজনীতিতে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীও তেমনি একজন ব্যতিক্রমী নেতা। তবে তাঁরও প্রধান ক্ষেত্র রাজনীতিই। গান্ধী বা বিনোবা ভাবে এর মতো ভাসানীর রাজনীতিও ধর্মবর্জিত ছিলোনা। গান্ধী বা ভাবে এর হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের অবিনাশী বাণীর প্রতি গভীর আস্থা ছিলো। কিন্তু তাঁরা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করেন নি। ভাসানীও ইসলাম ধর্মের সাম্য মৈত্রী ও মানবতার বাণী দ্বারা আনৃত্যু প্রভাবিত ছিলেন। কিন্তু মুসলীম লীগ, জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় সংগঠনের রাজনীতির নামে যে তৎপরতা তাকে তিনি ঘৃনা করতেন।

মওলানা ভাসানী ছিলেন মূলতঃ সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব। সমাবেশ সম্মেলন ও আন্দোলন ছিল তাঁর প্রধান রাজনৈতিক হাতিয়ার। তিনি সম্মেলনকে ব্যবহার করেছেন কর্মপন্থা নির্ধারন ও জনসাধারনের অধিকার সচেতনতা সৃষ্টির কাজে এবং আন্দোলনকে ব্যবহার করেছেন অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে । তবে তাঁর সম্মেলন বা আন্দোলনের রাজনীতি প্রধানত দরিদ্র, নিপীড়িত সমাজের স্বার্থে পরিচালিত হয়েছিল। তার রাজনীতিক পদ্ধতিকে সহিংস বা হিংসাত্মক বলা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

তার মতে ঃ - "রাজনীতি হইতেছে একটি মহৎ কর্মপ্রয়াস যাহার লক্ষ্য সমাজ হইতে অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ ও মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ প্রশস্ত করা; সমাজে ন্যায় বিচার, আইনের শাসন, বাকস্বাধীনতা, তথা সামগ্রিক গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করা"।[১] তিনি নিজে কেন রাজনীতিতে এলেন এ প্রশ্নের জবাব তিনি নিজেই মৃত্যুর চারদিন আগে তাঁর জীবনের শেষ ভাষণে দিয়ে গেছেন।

"অন্যায়ের প্রতি অনীহা আমাকে সারাজীবন বিভিন্নমুখী কর্মতৎপরতার প্রেরণা যুগাইয়াছে কিন্তু যে কৃষক, মজুর, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতী, ও মেথর প্রভৃতি মেহনতি মানুষের মুক্তির স্বপ্ন আমি আবাল্য দেখিয়াছি এবং সেজন্য সংগ্রাম করিয়াছী। তাহা আজও সুদূর পরাহত রহিয়া গিয়াছে। তাই আমার সংগ্রামের শেষ নাই। এই সংগ্রাম আজীবন চলবে।"[২]

জনগনের একটু খানি সেবা করার উদ্দেশ্যই রাজনীতিতে তাঁর প্রবেশ । নিজের ও বংশধরদের ভাগ্য গড়ার প্রয়োজনে নয়। এক্ষেত্রে তিনি সম্ভবতঃ সম্পূর্ন সার্থক। সুদীর্ঘ তাঁর কর্মজীবনে জনগনের সেবার মনোভাব থেকে এক মূহুর্তের জন্য ও তিনি সরে যাননি। তা তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের যে কেউই স্বীকার করবেন। তাই তাঁর সম্পর্কে ভারতের দৈনিক "স্টেটসম্যান" যথার্থই লিখেছিল Forever the Fighter চিরকালের যোদ্ধা। ষাট বছরের রাজনৈতিক জীবনে মজলুমের পক্ষ অবলম্বন করে তাঁর যে যুদ্ধ বা সংগ্রাম তা কোনদিন থামেনি। আরাম ছিলো তাঁর জীবনে হারাম। বস্তুত, তাঁর জীবনে বিশ্রাম ও শান্তি আসে তাঁর মৃত্যুর দিন। তিনি জীবনে বহুবার বলেছেন "শোষকের কোন জাতি নাই, ধর্ম নাই, দেশ নাই, বর্ণ নাই, তাঁর একমাত্র পরিচয় সে শোষক তাঁর এই বক্তব্যের তাৎপর্য গভীর এবং তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের সাথে সংগতি পূর্ণ। শোষকের অস্থিত্ব তিনি যেখানেই অনুভব করেছেন, প্রতিবাদে গর্জে উঠেছেন, সিংহের মতো"।[৩] সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য তাকে সারাজীবনই রাজপথে আন্দোলন করতে হয়। সারাজীবনই তিনি প্রগতিশীলদের নিয়ে কাজ করেছেন।

(১) রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তায় উপমহাদেশ- সৈয়দ মকসুদ আলী পৃষ্ঠা ১৯৯

(২) মজলুম জননেতা-মওলানা ভাসানী স্মারক সংকলন পৃষ্ঠা - ৭৬

(৩) মজলুম জননেতা-মওলানা ভাসানী স্মারক সংকলন পৃষ্ঠা - ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

দেশের সহায় সম্বলহীন দরিদ্র নিরক্ষর মানুষের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে তাঁকে এমন কিছু কাজও করতে হয়েছে যা যে কোন আধুনিক মানুষের দৃষ্টিতে কুসংস্কার মূলক মনে হবে সঙ্গত কারণেই। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চ শিক্ষা না থাকলেও ভাসানীর ঝোঁক ছিল অগ্রসর চিন্তাচেতনার দিকেই, হায়দার আকবর খান রনো মওলানাকে দেখেছেন এভাবেঃ- "মওলানা ভাসানী অতি আধুনিক মানুষ ছিলেন। তিনি কখনোই গোঁড়া নন। যে কোন সর্বাধুনিক আইডিয়া তাঁকে আকৃষ্ট করতো। তিনি বোঝার চেষ্টা করতেন এবং নিজের অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার সংঙ্গে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করতেন। কেউ কেউ বলতে পারেন যে লোক পীরগিরি করতেন, পানিপড়া দিতেন, তিনি কি করে আধুনিক হলেন? অত্যন্ত পশ্চাৎপদ মানুষের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে তিনি যে কৌশল নিতেন পানি পড়া ইত্যাদি তার অন্তর্ভুক্ত। আমি ভাল করেই জানি যে, তিনি পানি পড়ায় বিশ্বাস করতেন না। আমি দেখেছি কোন রোগীকে পানি পড়া দেবার পর মওলানা ভাসানী তাকে চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ দিতেন এবং সম্ভব হলে ডাক্তারের কাছে যাবার উপদেশ দিতেন। এর জন্য তিনি অর্থ সাহায্যও করতেন। তাঁকে এও বলতে শুনেছি, এই পানি পড়ায় রোগ সারবেনা, ডাক্তার দেখাও, এটা খাও, ঐটা খেয়োনা ইত্যাদি।

গণতন্ত্রের চিন্তাঃ

গণতন্ত্র বিশেষত সংসদীয় গণতন্ত্রকে মওলানা শ্রেষ্ঠ সরকার ব্যবস্থা মনে করেন। ব্যক্তিসত্তার পূর্ন বিকাশের জন্যই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন। তবে তাঁর গণতন্ত্র জনগণের গণতন্ত্র। তিনি বলেনঃ- "গণতন্ত্রের নিয়ম-যারা সংখ্যগরিষ্ঠ, যারা সংখ্যায় বেশী, তারাই দেশ শাসন করবে, পরিচালনা করবে। এই দেশে কৃষক মজুরের সংখ্যা শতকরা ৯৫ ভাগ। তারাই এদেশের শাসক হতে পারে। অন্য কেউ নয়।"[১]

(১) রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তায় উপমহাদেশ- সৈয়দ মকসুদ আলী পৃষ্ঠা ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা ভাসানী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার রাজনৈতিক দলের অপরিহার্যতা অস্বীকার করেননি। তবে রাজনৈতিক দল যদি দুর্নীতি, ক্ষমতালোলুপতা ও কায়েমী স্বার্থকে আশ্রয় করে চলে তাহলে তার মাধ্যমে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না এ রকম রাজনৈতিক দল সাধারণত গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করে। মওলানা ভাসানী নিজেও একাধিক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যখনি তিনি নিজ দলের অভ্যন্তরে দুর্নীতি ও কায়েমী স্বার্থচক্রের প্রাধান্য লক্ষ্য করেছেন সেই মুহুর্তে দলত্যাগ করে আবার নতুন দল গঠনে ব্রতী হয়েছেন।

মওলানা ভাসানী তাঁর জীবনের শেষদিকে প্রচলিত ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া ফেলেন এবং রাজনীতিতে আদর্শ ও চরিত্রবলের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছি, আদর্শ বোধবর্জিত শ্লোগানধর্মী ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনে ও সংগঠন মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তির নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে না। গভীর আদর্শবোধ সম্পন্ন চরিত্রবান এবং আপোষহীন সংগ্রামশীলতার অধিকারী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরাই মানুষের সার্বিক কল্যানের পথ সুগম করতে পারেন।"[১]

মওলানা ভাসানী কখনো গণতন্ত্রের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত খুজেঁ পাওয়া কঠিন। তিনি গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন প্রধানত এই কারণে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ধারণ এবং ক্ষমতা ত্যাগের সর্বাপেক্ষা সুসভ্য পন্থা হয়েছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচন।

মওলানা ভাসানী রাজনৈতিক গণতন্ত্র অর্থনীতিক গণতন্ত্রের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে শোষিত জনগণের মুক্তি এবং কায়েমী স্বার্থ চক্রের ধ্বংস ব্যতিরেকে গণতন্ত্র সার্থকতা লাভ করে না। অর্থাৎ, রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সাফল্যের পূর্ব শর্ত অর্থনীতিক গণতন্ত্র। তিনি কৃষক, শ্রমিক, কামার, কুমার, জেলে তাঁতী পিয়ন আর্দালী প্রভৃতী শোষিত শ্রেণীর অর্থনীতিক মুক্তির জন্য আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন।

(১) রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তায় উপমহাদেশ- সৈয়দ মকসুদ আলী পৃষ্ঠা ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা ভাসানী আজীবন সাধারণ মানুষের কাছে কাছে ছিলেন যে কারণে তাদের জীবন সম্পর্কে তাঁর প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল। সাধারণ মানুষের কল্যাণার্থে তিনি একটি বাস্তবসম্মত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি করতে চেয়েছিলেন। যেহেতু পুঁজিবাদী সমাজে সমাজতন্ত্র প্রবর্তন করা একটি দুরূহ কাজ সে কারণে মওলানা ভাসানী তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যাপারে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেন নি।

মওলানা ভাসানীর আর একটি বিশেষত্ব এই যে তিনি রাজনীতিতে অনুভুতি ও আবেগের প্রবাহ সঞ্চারিত করেছেন। মওলানার রাজনীতিতে আবেগের ও অনুভুতির অভাব কোনদিন হয়নি। বরং এটাই সত্য কথা যে তিনি এদেশের আবেগের প্রতিনিধি। আবেগের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, আবেগকে সংগঠিত করে রূপ দিয়েছেন রাজনীতিতে। অতএব যুক্তি সম্মতভাবে বলা যায় যে, রাজনীতিতে আবেগ ও অনুভুতির প্রবাহ সঞ্চারিত করে মওলানা ভাসানী অতি সহজেই জনগণের অন্তরে সাড়া জাগাতে পেরেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক সাফল্যের এটাই অন্যতম কারণ।

ধর্মীয় আন্তর্জাতিকতা ঃ

মওলানা ভাসানী ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে এক ধরনের আন্তর্জাতিকতা বাদের ধারনা ব্যাক্ত করেন। তিনি এক আল্লাহর প্রভুত্ব এবং পৃথিবীর যাবতীয় সম্পর্কে জাতি-ধর্ম-বর্ন নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার স্বীকার করবার জন্য মানব জাতির প্রতি আহ্বান জানান। "পারস্পারিক পালনবাদী সম্পর্কই হবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভিত্তি," এরই নাম " রব্বানী আন্তর্জাতিকতাবাদ।"

বিশ্বশান্তির সমর্থক ঃ

তিনি ছিলেন বিশ্বশান্তির একনিষ্ঠ সমর্থক, তিনি যুদ্ধনীতি পরিহার করার জন্য প্রাচ্যও পাশ্চাত্যের সকল গণতান্ত্রিক দেশের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি ছিলেন সামরিক জোট গঠনের তীব্র বিরোধী। তিনি যে কোন যুদ্ধজোটকে বিশ্বশান্তির পরিপন্থী ও মানব সভ্যতার পথে বাঁধা বলে গন্য করেন। তিনি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতিতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করেন যে, এরূপ নীতিই জনগণের প্রকৃত মুক্তি ও শান্তির পথ প্রশস্ত করবে। মওলানা ভাসানী সাম্রাজ্যবাদকে

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বের সমস্যা ও সংকটের অন্যতম মূল উৎস বলে মনে করেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

ভাসানীচিন্তার মূল্যায়ন ঃ

মওলানা ভাসানীর রাজনীতি ও রাজনীতির মতাদর্শ বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করা হয়েছে। বিশেষত মার্কসবাদী রাজনীতিবিদগণ তাঁর রাজনীতির তীব্র সমালোচক। তাঁদের যুক্তি-

প্রথমত, মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি একটি সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী দল হিসাবে জন্ম নেয় সত্য, কিন্তু এই দলটি বিদ্যমান ধনবাদী সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন বা উচ্ছেদের ব্যাপারে তেমন সংগ্রামী কর্মসুচী গ্রহন করে নি। এই দল (ন্যাপ) শুধুমাত্র জোতদারী, মহাজন প্রথার বিলোপের এবং "লাঙ্গল যার জমি তার" এই দাবি উচ্চারণ করেছিল বলেই এদেশের কৃষক সমাজের কিছুটা আস্থাভাজন হয়েছিল, কিন্তু বৈপ্লবিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য তেমন ইতিবাচক কোন পদক্ষেপ গ্রহন করে নি।

দ্বিতীয়তঃ মওলানা ভাসানী সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা হয়েও এক সময় এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে এ দেশের জন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ভিত্তিক সমাজতন্ত্র অনুপযোগী। তার পরিবর্তে তিনি ইসলামী সমাজতন্ত্র কায়েম করার কথা বলেন।

তৃতীয়ত ঃ মওলানা ভাসানী সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করার উপায় হিসাবে শুদ্ধি অভিযানের কথা বলেন। ঘুষখোর, চোরাকারবারী, চোর-ডাকাত, দুর্নীতিবাজ আমলা সি.আই. ও এজেন্ট এবং ভারতের সম্প্রসারণবাদী দালালরা ছিল তাঁর শুদ্ধি অভিযানের আসল লক্ষ্য। মওলানা ভাসানীর প্রধান দুর্বলতা এই যে তিনি সমাজদেহের ব্যাধির মূল কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেন নি। শুধু শুদ্ধি অভিযান দ্বারা সমাজদেহকে দুর্নীতিমুক্ত করা যায় না। যে সমাজব্যবস্থা দুর্নীতির জন্ম দেয়, দুর্নীতি লালন করে, তার আমুল সংস্কার ব্যতিরেকে দুর্নীতি রোধ করা যায় না এ কথা তিনি কতখানি উপলব্ধি করেছিলেন বলা কঠিন।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থত ঃ মওলানা ভাসানী 'কৃষক মজুর রাজ' কায়েম করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি কৃষক বিপ্লবের পথ অনুসরণ করেন নি। তিনি অগ্রসর হয়েছেন সর্বদলীয় সম্মেলন ও সংসদীয় পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। বলা বাহুল্য, এ পথে শুধু বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা অপরিবর্তিতে রাখা যায়, কোন বৈপ্লিবিক পরিবর্তন সাধন করা যায় না।

এসব বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও এদেশের রাজনীতিতে মওলানা ভাসানীর অবদানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। গোড়া থেকেই তার "রাজনীতি ছিল গণমুখী ও সংগ্রামমুখী। তার সংগ্রামী জীবনের প্রারম্ভেই বিভিন্ন কৃষক আন্দোলন মওলানার রাজনীতির চরিত্র নির্ধারণ করে দেয়। তার আপোষহীন সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদবিরোধী ভুমিকার মূলে ছিল কৃষক-জনতার স্বার্থ ও সংগ্রাম। মওলানা ছিলেন গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ও সরকারবিরোধী রাজনীতির জনক। মওলানা জীবনভর স্বৈরাচার ও সাম্রাজ্যবাদের শোষন আধিপত্যকে প্রতিহত করেছেন। তাঁর চেয়ে বড় সাফল্য এই যে তিনি কোটি কোটি মেহনতী মানুষকে সম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, সম্প্রাসারণবাদ ও আধিপত্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছেন, গণমানুষের কাছে সমাজতন্ত্রের ধ্বনি পৌঁছিয়েছেন। মওলানা ভাসানী তাত্ত্বিক নন, তিনি মূলত সংগ্রামী নেতা। যেখানেই অন্যায় ও দুর্নীতির ফণাবিস্তার লক্ষ্য করেছেন সেখানেই তা প্রতিহত করার জন্য সংগ্রাম সংগঠিত করেছেন। এক কালে যারা তাঁর সংগ্রামের সঙ্গী ছিলেন, তারা যখন ক্ষমতার শীর্ষে আরোহন করে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন মওলানা ভাসানী তখুনি তাঁদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছেন, এমনকি প্রতিরোধ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন।[১]

(১) সিরাজুল হোসেন খান, মওলানা ভাসানীর। আয়েফিন বাদল সম্পাদিত (ঢাকা ,১৯৭৭) পৃঃ ২৪

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের রাজনীতি মওলানা ভাসানীর অবদানঃ

তার দীর্ঘ জীবনের ক্ষেত্র বহু দিকে বিস্তৃত। মওলানা ভাসানী ছিলেন এক বিরাট জনগোষ্ঠীর কাছে ধর্মীয় গুরু বা পীর। তিনি অনেক সমাজসেবা মূলক কাজ করেছেন, কলেজ করেছেন। ছুটে গেছেন বন্যাপিড়ীত মানুষের সাহায্যার্থে। কিন্তু আমরা জানি, ভাসানীর জীবনে এগুলোর কোনটাই বড়দিক নয়। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি রাজনীতিবিদ। রাজনীতিরও বহু দিক আছে। তিনি এক সময়ে মুসলিম লীগ করেছেন, তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি ন্যাপ করেছেন, তিনি পাকিস্তান আন্দোলন করেছেন তিনি ৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করেছেন, তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে জনমত তৈরী করেছেন ইত্যাদি। মওলানা ভাসানীর কথা উঠলে তাঁর জীবনের এসব দিক আলোচিত হয়। তার জীবদ্দশায় যারা ছিল তার ঘোর শত্রু তারাও এখন ভাসানীর মাজারে ফুল দেয়, বক্তৃতা বিবৃতিতে শ্রদ্ধা জানায়। কারণ তাতে শোষক শ্রেনীর কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু সবচেয়ে কম উচ্চারিত হয় মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সেই দিকটি যা ছিল তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ভাসানী ছিলেন ধনীক ও শোষক শ্রেনীর বিরুদ্ধে আপোসহীন যোদ্ধা। তার সব কর্মকান্ডের প্রধান দিক ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় জমিদার, জোতদার, পুঁজিপতির বিরুদ্ধে নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম। এই কারণে শোষক শ্রেণী ও তাদের রাজনৈতিক দল তাকে কখনও দেখতে পারত না। এই কারণেই বুর্জোয়া কাগজগুলো তাকে যথাযথ স্থান দেয়নি। মওলানা ভাসানী এই শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থাকে ভাঙতে চেয়েছিলেন। সেজন্য তিনি ছিলেন বিপ্লবী, আর ঠিক এ জায়গাতেই তার সঙ্গে পার্থক্য ছিল জাতীয় পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে।

প্রথম অবদান -পাকিস্তান আমলে মওলানা ভাসানীই প্রথম রাজনৈতিক বিরোধী দল গড়ে তোলেন। তাও আবার পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যেই। পাকিস্তানে প্রথম গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির সূত্রপাত ঘটায় মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। শুধু তাই নয়, ইতিপূর্বে নবাব, জমিদার, অভিজাত শ্রেণী ও

Dhaka University Institutional Repository

ধনীক-বনিকদের মধ্যেই রাজনীতি সীমাবদ্ধ ছিল, বিশেষ করে মুসলিম লীগের রাজনীতি। পাকিস্তানের ইতিহাসে ভাসানীই প্রথম রাজনীতিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিয়ে এলেন।

দ্বিতীয় অবদান হল, তিনি পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম আসাম্প্রদায়িক রাজনীতির উদ্বোধন ঘটান। প্রথমে তাঁর দলের নাম ছিল 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'। পরে তিনি নিজেই উদ্যোগ নিয়ে দলের নাম থেকে 'মুসলিম শব্দটি' বাদ দেন।

ভাসানীর তৃতীয় অবদান- তিনি সর্বপ্রথম পূর্ব বাংলার জন্য স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের দাবি উত্থাপন করেন এবং এই দাবিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরের বছর ১৯৪৮ সালেই তিনি পূর্ব বাংলার জন্য প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলেন প্রাদেশিক আইন পরিষদের বিতর্কে। ১৯৫৬ সালে কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানীর আসসালামু আলাইকুমের হুমকি তো ইতিহাস বিখ্যাত। অর্থাৎ সেই সময়ই তিনি পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন, যা ষাটের দশকের শেষভাগে স্বাধীনতার চেতনায় রূপান্তরিত হয়েছিল।

মওলানা ভাসানীর চতুর্থ অবদান হল তিনিই সর্বপ্রথম পাকিস্তানের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা ও সংগ্রাম গড়ে তোলেন। মুসলিম লীগের মধ্যে মওলানা ভাসানীই একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন, যিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। পাকিস্তান আমলের ভাসানীই মার্কিন সম্পর্কে গণচেতনা তৈরী করতে সচেষ্ট হন। পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি, সিয়াটো, সেন্টোর (মার্কিন নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট) বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তার নেতৃত্বে ছিলেন মওলানা ভাসানী ।

এখানে উলেখ্য, পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি এই দুই প্রশ্নে (আরও একটি ইস্যু ছিল, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট) আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মধ্যে মতবিরোধ হয় । একদিকে ছিলেন মওলানা ভাসানী তিনি পূর্ব বাংলার এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ও চারটি প্রদেশের জন্য স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে এবং পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল ও সিয়াটো- সেন্টোর মতো যুদ্ধ জোট থেকে বেরিয়ে আসার পক্ষে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিয়েছেন। অন্যদিকে সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের

Dhaka University Institutional Repository

শাষকগোষ্ঠির সঙগে হাত মিলিয়ে পাক মার্কিন সামরিক চুক্তি, সিয়াটো- সেন্টোর পক্ষে অবস্থান নিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালালি করেছিলেন। এমন কি সোহরাওয়ার্দী এ কথাও বলেন-১৯৫৬ এর সংবিধানে নাকি ৯৮ শতাংশ স্বয়ত্তশাসন ইতিমধ্যেই অর্জিত হয়েছে। সোহরাওয়ার্দীর এমন বিশ্বসাঘাতকতার কারণে সেদিন আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে গিয়েছিল, ন্যাপের জন্ম হয়েছিল।

পঞ্চম অবদান হল-তিনি সমাজতন্ত্রকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন। ঘোর সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল পরিবেশের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির বিস্তার ঘটানো খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ আমল থেকেই এ দেশে গোপনে ও প্রকাশ্যে কাজ করে আসছিল। কিন্তু পূর্ব বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি তেমন ভিত্তি করতে পারেনি। আইডিয়া হিসেবেও সমাজতন্ত্র জনপ্রিয় ছিল না। মওলানা ভাসানী সব সময় সব চেয়ে প্রগতিশলী ও র‌্যাডিকেল আইডিয়াকে গ্রহন করেছেন। এট তার চরিত্রের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ভাসানীর সবচেয়ে বড় অবদান হল আরেকটি- তিনি রাজনীতির মঞ্চে নিয়ে এসেছেন কৃষক শ্রমিকসহ শোষিত শ্রেণীকে, তার রাজনীতির মর্মবস্তু ছিল শ্রেণী সংগ্রাম। সমাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা এবং শ্রেণী সংগ্রাম-এ কয়টি দিক ভাসানীর রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্য। আর ঠিক এ কারণে তার সঙ্গে কমিউনিষ্টদের খুবই ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। ত্যাগী, সংগ্রামী, বিপ্লবী ও সত্যিকারের কমিউনিস্টদের তিনি পুরো দরদ দিয়ে ভালবাসতেন, রাজনৈতিকভাবে আশ্রয় দিতেন এবং স্বীয় দলে গুরুত্বপূর্ন পদে বসাতেন।

মওলানা ভাসানী মার্কসবাদী ছিলেন না। সমাজতন্ত্র বুঝতেন তার মতো করে। কিন্তু সে বোঝার মধ্যে একটা মৌল দিক ছিল। তাল- শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং শোষিত মেহনতি শ্রেণীর পক্ষে। ধনীক শ্রেণীকে তিনি আসলেই ঘৃণা করতেন এবং মেহনতী শ্রেনীর প্রতি তার ছিল অকৃত্তিম ভালবাসা। নিজেও থাকতেন একেবারে গতীর কৃষকে মতো। কিছুটা টিনের কিছুটা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘর। ফ্লোরটা মাটির। আসবাবপত্র বলতে কিছুই নেই। একখানা চৌকির ওপর সামান্য মাদুর পাতা। সেখানে তিনি ঘুমাতেন। যে কোন গরিব মানুষ কাদামাখা খালি পায়ে তার বারান্দায়

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থিত হতে পারত। কখনও দেখো যেত, রাস্তার কুকুর তার শোয়ার ঘরের একপাশের দরজা নিয়ে ঢুকে অপর দরজা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। কাঠের চুলোর কাছে বসে তার স্ত্রী রান্না করেছেন তার পরিবারের সদস্যরা টিউবওয়েল থেকে পানি নিয়ে আসছে। গৃহভৃত্য বলতে কেউ নেই। পোষাকে, আচরণে, প্রাত্যহিক জীবন ধারণে সাধারণ গরিব মানুষের এত কাছে আমাদের দেশের জাতীয় পর্যায়ের আর কোন নেতাই ছিলেন না । প্রকৃত অর্থেই মওলানা ভাসানী ছিলেন 'মজলুম জননেতা', গরিব মেহনতী মানুষের নেতা। তিনি নিজে ছিলেন তাদেরই একজন, রাজনীতিটাও ছিল মেহনতী মানুষের রাজনীতি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সদ্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত শাসক শ্রেণীর অত্যাচার, লুটপাট ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ভাসানী ছিলেন চিরবিদ্রোহী। যখনি যেখানে অত্যাচার, শোষণ, ভাসানীর কণ্ঠ সেখানেই ছিল সোচ্চার। তার বক্তৃতায় যেন আগুন জ্বলে উঠত। গণমানুষকে বিদ্রোহে জাগিয়ে তোলার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তার। তার মৃত্যুর এত বছর পরও ভাসানীর শক্তি এখনও নিঃশেষ হয়ে যায়নি । গরিব মেহনতী মানুষের মধ্যে ভাসানীর নাম এখনও আবেদন সৃষ্টি করে। আমাদের কর্তব্য হল-নতুন পরিস্থিতিতে ভাসানীর আদর্শ তুলে ধরা।

মওলানা ভাসানীর শিক্ষা দর্শন ঃ-

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বাংলাদেশের মানুষের চিন্তা ও চেতনায় মন ও মানসে রাজনীতিতে সংগ্রাম ও আন্দোলনে, যেমন এক বিপ্লবী ধারা সৃষ্টি করে গেছেন তেমনি এদেশের শিক্ষা চিন্তাতেও তিনি তার বৈপ্লবিক দর্শনের প্রভাব রেখে গেছেন। তার রাজনৈতিক দর্শনের লক্ষ্য ছিলো আল্লাহর যমীনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা অর্থাৎ 'হুকুমাতে রব্বানিয়া প্রতিষ্ঠা' করা। আর সেই হুকুমাতে রব্বানিয়া প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি একটি সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো উপস্থাপন করে গেছেন। তিনি আজীবন কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। তাদের মুখে হাসি ফুটানো তাদের সংসারে সুখ ও সমৃদ্ধি আনার লক্ষ্যে তিনি সকল শোষনমূলক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জোর সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন, পাশাপাশি

Dhaka University Institutional Repository

এদেশের প্রতিটি মানুষ যাতে শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত হতে পারে সে জন্যও বাস্তব কর্মসূচী গ্রহন করেছেন।

মওলানা ভাসানীর শিক্ষা দর্শনের প্রতিফলন আমরা পূর্ণভাবে দেখেতে পাই তাঁর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে। শিক্ষার প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ অনুরাগ। তিনি বুঝেছিলেন জাতিকে যদি শিক্ষার আলোয় আলোকিত না করা যায়, তাহলে জাতির পূর্ণ কল্যাণ আসবে না। তাই তিনি একটি সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেন। ১৯৫৭ সাল থেকেই তিনি সন্তোষে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে তার লেখা 'আমার পরিকল্পনায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' নামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয় জাতীয় পত্রিকা সমুহে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিনি টাংগাইলের ব্যাংকে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় নামে হিসাব খোলেন। ১৯৭০ সালের ৮ সেপ্টেম্বর সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দরবার হল উদ্বোধন করেন। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত এক ভাষনে তিনি বলেন- কাগমারী পরগণায় সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রদত্ত ওয়াকফ সম্পত্তিতে পীর শাহজামানের মিশন বাস্তবায়নই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৪২ সাল থেকে শুরু হয়েছে আমার এ সংগ্রাম। ১৯৫৭ সালে পেশ করেছিলাম আর ১৩৯০ হিজরীর ৬ই রজব মোতাবেক ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ ইংরেজী সালে এর প্রতিষ্ঠা দিবস ঘোষনা করলাম। ১৯৭১ এর ২৭শে ফেব্রুয়ারী সন্তোষে অনুষ্ঠিত হয় এক সম্মেলন। এই সম্মেলনে তিনি ঘোষনা করেন সাম্যবাদ পুঁজিবাদ ও নাস্তিক্যবাদের প্রভাবমুক্ত আমাদের উপযোগী একটি আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা। এর রূপরেখা কি হইতে পারে এবং শিক্ষাকে কিভাবে বাংলাদেশের সকল মানুষের দরজায় পৌঁছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে এইসব বিষয়ে বাস্তব নজির প্রতিষ্ঠার জন্য আমি সন্তোষে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় রাখিয়া যাইতেছি। তিনি আরও বলেন, আমাদিগকে আজ এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী তত্ত্বগত শিক্ষার পাশাপাশি কৃষি, বিভিন্ন কুটির শিল্প কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার হাতে কলমে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাইবে। মনের উৎকর্ষ সাধন, রূহের শক্তি বৃদ্ধির অবকাশ থাকিবে যাহা কেরানী ও গোলাম সৃষ্টি না করিয়া মানব দরদী, আত্মনির্ভরশীল,

Dhaka University Institutional Repository

পরিশ্রমী এবং দেহ-মন-আত্মার দিক দিয়া সুস্থ চরিত্রবান ঈমানদার নাগরিক গড়িয়া তুলিবে।

স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েম হবার পর ১৯৭৩ এর ১২ ডিসেম্বর, ১৯৭৪-এর ৭ এপ্রিল - ২৭শে জুলাই দেশ বিদেশের শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশ ঘটান।

তিনি সারা জীবন সাধারণ মানুষের কাছাকাছি থেকে তাদের ভাগ্যের সংগ্রাম করেছেন। গড়ে তুলেছেন ইসলামীক বিশ্ববিদ্যালয় টেকনিক্যাল কলেজ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বালক হাই স্কুল, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বালিকা হাই স্কুল, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সূচীশিল্প স্কুল, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বহুমূখী কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ভোগ্যপন্য সরবরাহ সমবায় সমিতি লিমিটেড, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ড্রাইভিং স্কুল প্রভৃতি। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনার মাধ্যমে তিনি কোন বৈপ্লবিক শিক্ষা দর্শন উপস্থাপন করলেন, সে সম্পর্কে বলতে যেয়ে তিনি বলেন - দেশে শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদগণ যখন শিক্ষা ব্যবস্থা লইয়া চিন্তা ভাবনা করিতেছেন তখন আমি কেনইবা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা গ্রহন করিলাম ইহা একটি প্রশ্ন বটে। স্পষ্টভাষায় আমি বলিতে চাই ইহার কারণ আমার হতাশা ও উপলব্ধি দুই-ই। আমি বাংলাদেশের শিক্ষাবিদদের সম্পর্কে হতাশ হইয়াছি। তাহারা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এমন শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করিতে চান-যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা অন্ধ হইয়া যাইবে-কাহাকে মাথায় তুলিয়া নাচিবে, আবার কাহাকে ঘৃনা ও অবজ্ঞাভরে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে। সোজা কথায় ছাত্র ছাত্রীরা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও অজ্ঞ থাকিয়া যায়, মূর্খতার স্বভাব লাভ করে যায়। দ্বিতীয়তঃ আমি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি গণচেতনা ও গণআন্দোলনের সাথে সাথে আগামী দিনের জন্য ত্যাগী পুরুষ গড়িয়া তোলা দরকার। তাহারা শুধু ত্যাগীই নয় সাধক ও । তাহারাই চিন্তাবিদ, তাহারাই কর্মী, তাহারাই নেতা। এমন পুরুষই সমাজের জন্য কাম্য বটে। কিন্তু তাহার আবির্ভাবের জন্য প্রকৃতির দিকে চাহিয়া থাকিলে চলিবে না, এহেন পরিবেশও বজায় রাখিতে হইবে।

তিনি তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বলেন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি কাজ হইবে। একটি পড়াশোনা আর একটি শিক্ষাদিক্ষা। তিনি বলেন, 'ভাষা সাহিত্য', বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভুগোল, বানিজ্য, দর্শন, অর্থনীতি,

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রনীতি, সমাজতত্র, ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় পড়াশুনার সুযোগ থাকিবে। তবে বিশেষ করিয়া ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি ও সমাজতন্ত্রের পাঠ্য বিষয় বাছাইয়ের ব্যাপারে এমন একটি মাপকাঠি ও দৃষ্টিভঙ্গী থাকিবে যাহাতে ছাত্র-ছাত্রীর মানবতার কল্যাণকে সব কিছুর উর্ধ্বে স্থান দেওয়ার মানসিকতা অর্জন করিতে পারে। আমি বিশ্বাস করি এই সবে এমন উপাদান রহিয়াছে যাহা প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীকে বিপ্লবী তৎসঙ্গে সহনশীল, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী দেশপ্রেমিক ও আন্তর্জাতিকতাবাদী করিয়া তুলিতে পারে । (দ্রঃ মওলানা ভাসানী, আমার পরিকল্পনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)।

তিনি শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে কোরআন হাদীসের মৌলিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি এমন একটি সমাজের সৃষ্টি করতে চান যারা হবে সত্যিকার অর্থে মানুষ। তিনি বলেন, তাহারা হইবে আবুজর গিফারীর মত প্রতিবাদকারী, হযরত আলীর ন্যায় জ্ঞান পিপাসু, গাজী সালাহউদ্দীনের মতই মোজাহেদ এবং ইমাম আবু হানিফার ন্যায় শহীদ। (দ্রঃ মওলানা ভাসানী, আমার পরিকল্পনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)।

মওলানা ভাসানী আমাদের জাতীয় চেতনায় যে শিক্ষা দর্শন সঞ্চারিত করে গেছেন এবং সামাজিক কাঠামো নির্মানে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন- তা রব্বানী দর্শনের মধ্যে নিহিত রয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় তিনি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণমূলক দর্শন রেখে গেছেন। তাঁর শিক্ষা দর্শন সত্যিকার ভাবে মানুষ হবার দর্শন।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় - ৭

মওলানা ভাসানী ও আজকের রাজনীতিবিদ।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের জীবনের সাথে আজ রাজনীতি শব্দটি অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই রাজনীতি শুরু। আর রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত রাজনীতিবিদ। তাই তারা কেমন হবে, কেমন হওয়া উচিত কিভাবে কাজ করবে বা করা উচিত ইত্যাদি বিষয় গুলো সব সময়ই গুরুত্বপূর্ন বিষয়। তাই রাজনীতির ইতিহাস পর্যবেক্ষন করলে কিংবা বিশ্লেষণ করলে আমরা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকম রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের চিত্র দেখতে পাই।

প্রচীন যুগের রাষ্ট্রচিন্তাবিদরা অর্থাৎ প্লেটো এ্যরিষ্টটলের লেখায় আমরা রাজনীতি এবং রাজনীতিবিদের চিত্র দেখতে পাই। যদিও তাঁরা তাদের লেখনীতে রাজনীতিবিদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদান করেন তথাপিও রাজনীতিবিদদের জীবন অর্পিত থাকে শুধুমাত্র রাষ্ট্রের সেবা করার জন্য, কল্যাণ করার জন্য। প্রচীন যুগের রাষ্ট্রচিন্তাবিদরা সর্বদা রাজনীতিবিদদের জনসেবামূলক রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁদের মতে রাজনীতি তারাই করবে যাদের জনসেবা করার মত অফুরন্ত সময় রয়েছে। যাদের নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা করতে হয়না তারাই রাজনীতি চর্চা করবে। জনসেবাকে কেন্দ্র করে হবে রাজনীতির চর্চা।

মধ্যযুগের চিন্তাবিদদের মধ্যে এই চিন্তাধারার পরিবর্তন দেখা যায়। মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তাবিদরা রাজনীতির সাথে ধর্মকে সম্পৃক্ত করে ফেলেন। ব্যক্তির উর্ধ্বে অবস্থান তৈরী করে। ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনীতির অর্থাৎ ক্ষমতার চর্চা করা হয়। পুরো মধ্যযুগে বলে চার্চ এবং রাষ্ট্রের দ্বন্দ। অর্থাৎ কে বেশী ক্ষমতার চর্চা করবে।

আর এই ক্ষমতাকে কেন্দ্র করেই শুরু আধুনিক যুগের রাষ্ট্রচিন্তাবিদদের রাষ্ট্রচিন্তা। তাদের রাজনীতির মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় ক্ষমতা। জনসেবা থেকে সরে এসে শুরু করে ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে রাজনীতির চর্চা। ম্যাকিয়াভেলীর লেখায় আমরা দেখতে পাই শাসকের রুপ হবে শিয়ালের মত ধূর্ত এবং সিংহের মত হিংস্র। এরপর থেকেই

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তন হয় শাসকের রূপ। এই সূত্রের উপর ভিত্তি করেই তৈরী হতে থাকে শাসকের রূপের পরিবর্তন।

অতি আধুনিক চিন্তাবিদ হ্যারল্ড ল্যাসওয়েলের মতে, "Who gets, what, when and How" বর্তমান সময়ের শাষকরা ক্ষমতাকে যে কোন ভাবেই হোক না কেন দখল করতে চাচ্ছে এবং নিজের মতো করে তা ব্যবহার করছে। ফলে আজ রাজনীতি ব্যবসার পরিনত হয়েছে। শুরু হয়েছে লুটপাটের রাজনীতি। রাজনীতিতে আজ রাজনীতিবিদরা রক্ষকের পরিবর্তে ভাক্ষকে পরিণত হয়েছে। জনসেবার পরিবর্তে জনশোষণ হয়েছে তাদের রাজনীতির লক্ষ্যও উদ্দেশ্যে।

আমাদের দেশের রাজনীতিতেও তারই রূপ ফুটে উঠেছে। আমাদের প্রাক্তন রাজনীতিবিদরা যেমন সহীদ সোহরাওয়ার্দী, একে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী যে আদর্শকে সামনে রেখে রাজনীতি করেছেন ঠিক তার বিপরীতপথে চলছেন আজকের রাজনীতিবিদরা। আজকের রাজনীতিবিদদের মধ্যে নৈতিকতা, আদর্শ, জনসেবা, সাহসিকতা, সত্যবাদীতা, দেশপ্রেম প্রভৃতি গুনের বড়ই অভাব। কালো টাকা অস্ত্রের দ্বারা রাজনীতির চর্চা করছে আজকের রাজনীতিবিদরা তাঁদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে সমগ্র দেশের জনগণ। আর তাই আপামর জনসাধারণকে এই দুঃসময় থেকে উদ্ধার করার জন্য মওলানা ভাসানীর মত একজন নেতার বড় প্রয়োজন কিংবা তাঁর আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একজন নেতার দেশের হাল ধরা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে এর কোন বিকল্প নেই।

Dhaka University Institutional Repository

ভাসানী মানে চিরবিদ্রোহীর নাম
ভাসানী মানে কৃষকের সংগ্রাম
ভাসানী মানে মজলুম জননেতা
ভাসানী মানে সকল যুদ্ধে জেতা।

ভাসানী মানে বাংলা বর্ণমালা
ভাসানী মানে পর্ণকুটিরে চালা
ভাসানী মানে উত্তাল পল্টন
ভাসানী মানে সুষম বন্টন।

ভাসানী মানে শোষকের যমদূত
ভাসানী মানে মহাত্যাগী অদ্ভুত
ভাসানী মানে কৃষকের জাগরণ
ভাসানী মানে মিছিল ও আন্দোলন।

ভাসানী মানে দুখীদের অন্তর
ভাসানী মানে মহীপুর অন্তর
ভাসানী মানে বটবৃক্ষের ছায়া
ভাসানী মানে মাঠের সবুজ মায়া।

ভাসানী মানে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়া
ভাসানী মানে বৈশাখী ঝড়ো হাওয়া
ভাসানী মানে মহামিলনের সন্তোষ
ভাসানী মানে বজ্রকণ্ঠ-খামোশ!

কবি আবু ছালেহ "চিরবিদ্রোহী নাম" নামক কবিতায় যে নেতার ছবি তুলে ধরেছেন সেইরূপে নেতা সমগ্র পৃথিবীতে আর কয়জন খুঁজে পাওয়া যাবে ? একজন অতি

Dhaka University Institutional Repository

বড়ো মাপের দেশপ্রেমিক নেতার যে সব গুণাবলী থাকা দরকার তার সবগুলোই ছিল মওলানা ভাসানীর মধ্যে, যা তাঁকে অনন্য সাধারণ নেতৃত্বের মহিমায় মহিমান্বিত করে।

এমন একজন বড়মাপের জনদরদী নেতা যে দেশের নেতা সে দেশের মানুষের কাছে তিনি সারাজীবন পরম পূজনীয় ব্যক্তি হওয়ার কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্যি কথাটি হলো-মওলানা ভাসানী আজ আমাদের কাছে ইতিহাস, আমরা তাকে খুঁজে পাই কিছু বই পুস্তকে, তাঁর জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকীর কিছু পত্রিকার কলাম বিভাগে এবং তাঁর স্মরনে বিভিন্ন সভা সমিতিতে।

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রীদের কাছে তাঁর দর্শনের বিন্দু মাত্র মূল্য আছে মনে হয় না। প্রকৃত অর্থে রাজনীতি করার বর্তমান অর্থ হচ্ছে ক্ষমতাবান ও সম্পদশালী হওয়া। বর্তমানে এদেশের নেতৃবৃন্দকে পরম তৃপ্তমানে হয়। নিজেদেরকে তাঁরা বিশাল নেতা মনে করেন। এতই বড় যে, ধরা ছোঁয়ার বাইরে। পার্টি ও জনগনের জবাবদিহিতার উর্ধ্বে। মেহনতি জনগনতো দুরের কথা, পার্টির কর্মীরাই তাদের কাছে যেতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেনা । দূর নক্ষত্রের মতো তাদের অবস্থান মেহনতি শ্রেণীর কাছে। দামি দামি গাড়িতে চড়ে তাঁরা আসে মঞ্চে নিজেদের কাল্পনিক সাফল্যের ফর্দ শোনাতে আর গাল ভরা বুলি দিয়ে অসংখ্য মিথ্যা প্রতিশ্রুতির মালা গাঁথতে। আর তাদের এই বক্তব্য ক্রমশই সাধারণ জনগনের সাথে তাদের দুরত্ব বাড়িয়ে চলে। আজকে একজন নেতার গুনাবলীর মধ্যে রয়েছে দেশ ও জনগনের প্রতি অবহেলার মানসিকতা, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পদের পাহাড় গড়ার প্রবনতা, নিজে দুর্নীতি করা এবং আশেপাশে সবাইকে দুর্নীতিতে প্রশ্রয় দান করা, মিথ্যা কথা বলা, প্রতিশ্রুতির প্রতি উদাসীনতা, গায়ের জোড়ে সবকিছু দখল করে নেয়ার প্রবণতা, নিজেকে সেরা মনে করা বা সকলের চেয়ে সেরা হিসাবে উপস্থাপন করা ইত্যাদি। প্রকৃত নেতার গুনাবলীর ঠিক বিপরীত বিষয়গুলোকেই আজ ধারন করছে আমদের রাজনীতিবিদরা। যা আমাদের জন্য সত্যিই দুঃখজনক, এবং

Dhaka University Institutional Repository

ভয়ানক এক ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যার থেকে মুক্তির পথ আমাদের এখুনিই খুঁজে বের করতে হবে।

সাম্রাজ্যদের দালাল এদেশের বুর্জোয়া শাসক শ্রেণী মওলানা ভাসানীকে নিয়ে স্থুল রাজনৈতিক খেলায় মেতেছে। ভাসানী যেহেতু আওয়ামী লীগ পরিত্যাগ করে নতুন দল গঠন করেছিলেন, তাই আওয়ামী লীগ বরাবরই মওলানা ভাসানীর প্রতি ছিল বিদ্বেষ প্রবণ। ১৯৯৬ সালে ২১ বছর পর সরকার গঠন করার পরবর্তীতে ভাসানীর প্রতি সেই পুরনো বিদ্বেষ আওয়ামী লীগ আর ঢেকে রাখতে পারেনি। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধান মন্ত্রী ভারতের সাথে পানি চুক্তি স্বাক্ষর শেষে দেশে ফিরে তার উচ্ছ্বসিত বক্তৃতার ফাঁকে ভাসানীকে কটাক্ষ করে বলেছিলেন, "পানির জন্য কেউ কেউ ফারাক্কা মিছিল করেও ভারত থেকে এক ফোঁটা পানিও আনতে পারেনি, আমি তা করতে সক্ষম হয়েছি"।

আর বি এনপি সরকার ১৯৯১ সালে এবং ২০০১ সালে ক্ষমতায় গিয়ে ভাসানীকে নিয়ে যা করেছে তা হলো ভাসানীর রাজনৈতিক চরিত্র ও অর্জনকে ভুলণ্ঠিত করা। প্রতি বছর এরা ১৭ নভেম্বর ভাসানীর মৃত্যুবার্ষিকীতে সন্তেষে তাঁর কবরে গিয়ে মাতম করে, জাতীয় ভাবে বিভিন্ন সেমিনার করে, বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলে বেড়ায়, সাম্রাজ্যবাদের দালাল বুর্জোয়া শাসক শ্রেণীর খপ্পর থেকে মওলানা ভাসানীকে উদ্ধার করতে পারেন একমাত্র এদেশের বামপন্থী ও কমিউনিষ্টরাই।

মওলানা ভাসানীর সঠিক মূল্যায়ন করতে পারে এদেশে একমাত্র বামপন্থী ও কমিউনিষ্টরাই। কৃষকসহ সর্বস্তরের মেহনতি শ্রেণীর মুক্তির জন্য মওলানা ভাসানী জীবনব্যাপী যে সংগ্রাম করে গেছেন, সেই সংগ্রামকে পূর্ণতা দিতে হবে কমিউনিষ্টদের মাধ্যমেই। সেই লক্ষ্যে সর্বস্বরের কমিউনিষ্টদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে মেহনতি শ্রেণীর শোষন মুক্তির লড়াইকে সংগঠিত করতে হবে, বিকশিত করতে হবে, জয়যুক্ত করতে হবে। সবশেষে বলা যায়- আমাদের বর্তমান রাজনীতিবিদদের তাদের সকল লোভ লালসা, বা ব্যক্তি স্বার্থের উর্দ্ধে অবস্থান করতে হবে। দেশপ্রেমে

Dhaka University Institutional Repository

উদ্বুদ্ধ হতে হবে। এদেশের কৃষক, শ্রমিক,কামার, কুমার, তাঁতী, জেলে সহ সকল মেহনতি জনগনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। ব্যপক ঐক্য গড়ে তুলতে হবে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে-যে আদর্শের রাজনীতি মওলানা ভাসানী সারাজীবন করে গেছেন সেই পথে এগিয়ে যেতে হবে। প্রকৃত পক্ষে বর্তমান সময়ে মওলানা ভাসানীর মত একজন নেতার প্রয়োজন বড় বেশী। দেশের বর্তমান চরম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সংকট মোচনের জন্য মওলানা ভাসানীর মত যোগ্যতাসম্পন্ন সত্যিকারের একজন রাজনীতি বিদের প্রয়োজন। তাঁর মতো আদর্শ ও নীতিবান রাজনৈতিক নেতা ছাড়া জনগনের পক্ষের রাজনীতিকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। মওলানা ভাসানী এ দেশের রাজনীতিতে যে সদর্থক ভূমিকা রেখে গেছেন তা বাংলাদেশের ভবিষ্যত রাজনীতির জন্য সঠিক পথ নির্ধারণের প্রেরণা যোগাতে পারে। অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সুস্থ রাজনীতির বিষয়ে এবং প্রয়োজনে তা সত্য। এদেশের শোষিত বঞ্চিত নির্যাতিত মানুষের সঠিক মুক্তির অন্য কোন বিকল্প নেই।

মওলানা ভাসানীর ধর্ম ও রাজনীতি ঃ-

আবদুল হামিদ খান ভাসানী নামের আগে মাওলানা আছে বলে তাঁর দাড়ি আর টুপির জন্যে এবং আল্লাহ্ রসুল ও ইসলামের কথা বলেছেন বলে অনেকেই তাঁকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন ।

মওলানা ভাসানী ছিলেন একজন পীর একজন ধর্মীয় নেতা, মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ , সকল সর্বহারা মাটির মানুষের নেতা । মওলানা ভাসানীর অন্তরে আকৈশর একটা ইসলামী রাষ্ট্রগঠনের সাধ ছিল। তাঁর সমগ্র জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিভিন্ন যুগের কার্যাবলীকে পাঠ করলে তাতে অসঙ্গতির কোন লক্ষনই প্রকাশ পায়না । কৃষক শ্রমিক মজুরের জন্য আন্দোলন, বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বহির্ভূত কোন আন্দোলন নয়। ইসলামী বিধান মতে সমাজ ও রাষ্ট্রে কোথাও অবিচার বা জুলুম থাকবে না কাজেই কৃষক শ্রমিক মজুরের মুক্তির জন্য তিনি যে আন্দোলন করেছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

তা কেবল ইসলাম অনুমোদিত নয় ইসলামী জীবন ধারায় বিশ্বাসী লোকদের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। বাঙ্গাল খেদা আন্দোলনের শিকার হয়ে যে সব লোক ইতর প্রানীদের চেয়েও হীনতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিল তাদের পূর্ণবাসনের জন্য এবং স্থায়ী স্থিতির জন্য তাঁর পক্ষে আন্দোলন করা অবশ্যই কর্তব্য ছিল। তেমনি এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মাতৃভাষা বাংলার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর আন্দোলন একজন সত্যিকার ইসলামপন্থী নেতারই আন্দোলন। তাঁর মতো ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় দৃঢ় বিশ্বাসী লোক পতিত, নির্যাতিত ও দুঃস্থ মানুষের উত্থানের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ন হওয়ার কালে, তাঁর পার্শ্বে কম্যুনিষ্ট মতাবলম্বী লোকের দাঁড়ানোতে কোন অসঙ্গতি দেখা দেয়নি। তাঁর সঙ্গে কম্যুনিষ্টদের সাময়িক ঐক্যের জন্য তাঁকে কম্যুনিষ্ট ভাবাশ্রিত বলার কোন সংগত কারণ নেই। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্যে ছিল এক আদর্শিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করে তাতে ন্যায়বিচার প্রেম, দয়ামায়া মৈত্রী প্রভৃতি সদগুনাবলীর প্রতিষ্ঠা করে মানবসমাজকে কল্যানের ও মঙ্গলের পথে নিয়ে যাওয়া।

মওলানা ভাসানীর শুধু একজন আল্লাহ্ ভক্ত শরীয়ত - পায়বন্দ পাক্কা মুসলমান ও মওলানাই নন, তিনি জাতি, সমাজ ও জনগনের জন্যে উৎসর্গীকৃত একটি নিবেদিত প্রাণ। তিনি যথাযথ ভাবেই এদেশের চাষী, জেলে, কামার, কুমার তাতী খেটে খাওয়া নেংটি পরা হাড্ডিসার মানুষের দুমুঠো ভাত ও এক টুকরা কাপড়ের জন্য কিছু করতে চেয়েছিলেন। যিনি নিজে সহজ সরল জীবন যাপন করেন, ব্যক্তি স্বার্থ ও বৈভবের পিছনে ছোটেননি, ক্ষমতা লাভের জন্য পাগল হননি, কিংবা মন্ত্রী মেম্বার হতে চাননি। নিজের দলকে ক্ষমতায় বসানোর আকাংখা পোষন করেননি। বিদ্রোহী কন্ঠে তিনি সর্বদাই এদেশের মজলুম নির্যাতিত মানুষের রুটি রুজীর জন্য হুংকার ছেড়েছেন। আর তাতেই আপামর মেহনতি জনসাধারন ক্রমেই এই মানুষটির নেতৃত্বের প্রতি আস্থাবান হয়েছেন। জনগনের স্বার্থে নিবেদিত প্রাণ মওলানা ভাসানী তাঁর স্পষ্টবাদীতার জন্যও চিরদিন অনেকের বিরাগভাজন হয়েছেন। এসব কারনেই তিনি নিজের হাতে গড়া সংগঠন আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে দেন এবং ন্যাপ থেকেও ক্রমে সরে আসেন।

Dhaka University Institutional Repository

সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ, উদ্দেশ্য প্রভৃতির মধ্য দিয়ে মওলানা ভাসানী পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, এদেশের অন্যান্য পীর ও মাওলানা ধর্মব্যবসায়ী কিংবা রাজনীতিকদের সাথে তাঁর সুস্পষ্ট পার্থক্য। আজীবন শিক্ষানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জীবনের অনন্য কীর্তি "সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়" কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পটভূমিকা, ইতিহাস এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর দর্পন রুপরেখা এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে অনেকেই সঠিকভাবে অবহিত নন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা বাধ্যতামূলকভাবে কোরআন ও হাদীসের সত্যিকার এর ব্যাখ্যা যা সর্বযুগে বৈপ্লবিক চেতনার উন্মেষ সাধন করবে এবং তা রপ্ত করবে। তাদের সঙ্কীর্নমনা করবেনা, কুপমন্ডতা হতে দেবেনা। তারা আবুজর গিফারীর মত প্রতিবাদকারী, হযরত আলীর মত জ্ঞান পিপাসু, গাজী সালাউদ্দীনের মতই মোজাহেদ ও ইমাম আবু হানিফার মত শহীদ হবে। তারা যেমন অব্রাহাম লিংকনকে শ্রদ্ধা করবে, তেমনি প্রয়োজনে মাও সেতুংকে শ্রদ্ধা করবে। বাহ্যত: বিষয়টি পরস্পর বিরোধী মনে হলেও বাস্তবে নিঃসন্দেহে প্রমান করা যাবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাদানে গড়া প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী চিন্তা ও কর্মে হবে আত্মনির্ভরশীল অথচ আত্মকেন্দ্রিক নয়, আত্মসচেতন কিন্তু অহঙ্কারী নয়।

গোটা বিশ্ববিদ্যালয় হবে আবাসিক। প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী দিন রাত এখানেই থাকবে। বাইরের অশুভ সংশ্রব থেকে তাদের মুক্ত রাখা হবে। তারা নিদ্দের হাতে রান্না করা মোটা ভাত খাবে । নিজেদের হাতে বোনা মোটা কাপড় পড়বে, জীবনের যে কোন বিপর্যয়কে হাসিমুখে বরণ করে নিতে তাদের শুধু কঠোর পরিশ্রমই নয়, রীতিমত কষ্ট সহ্য করার শিক্ষা দেয়া হবে। প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য নির্দিষ্ট মাত্রার দৈহিক প্রশিক্ষন বাধ্যতামূলক থাকবে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বিজ্ঞান, কলা, বানিজ্য পড়ানো হলেও প্রতিটি ছাত্রের জন্য একটি কারিগরী শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকবে। কেরোসিন, তেল, লবন ছাড়া প্রয়োজনীয় সর্বকিছুই বিশ্ববিদ্যালয়ে চত্বরে ছাত্রদের নিজেদেরই উৎপাদন করে নিতে হবে। । প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা বৎসর কালে মাসে চার পাঁচ সপ্তাহকাল প্রত্যন্ত গ্রামে কিংবা শিল্প এলাকায় হাতে কলমে কাজ

Dhaka University Institutional Repository

করতে হবে ইত্যাদি। মওলানা ভাসানীর দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর পরিকল্পিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে কেন সম্ভবতঃ পৃথিবীর যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পৃথক ধরনের হবে।

মওলানা ভাসানীর রাজনীতি ছিল কোরান ও সুন্নাহ্র নির্দেশ মোতাবেক শোষনমুক্ত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম কর। তিনি কোন অবস্থাতেই সর্বশক্তিমান পরম করুনাময় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ রাব্বুল আল-আমীন কে বাদ দিয়ে নয় ধর্মকে বহাল রেখে কোরআন সুন্নাহর নির্দেশ মোতাবেক প্রকৃত ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। অথচ চিরকাল নাস্ত্বিক, বামপন্থী কমিউনিষ্টরাই জননেতা মওলানাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে, কিন্তু মওলানা মুনশী আলেম সমাজ তাঁর কাছে ঘেষেনি। এটাই ছিল ভাসানীর রাজনৈতিক জীবনের বড় ট্রাজেডী। এ প্রসংগে একটি কথা অবশ্যই বলতে হয়, মওলানা ভাসানী প্রকৃত অর্থে যদিও ধর্ম ব্যবসায়ী পীর ছিলেন না তবুও সারা দেশে এখনো তাঁর যে পরিমান ভক্ত, অনুরক্ত ও মুরীদ রয়েছে তা অনেকের জন্যই রীতিমতো ঈর্ষার বিষয়। মানব কল্যাণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা ও শোষনমুক্তির, স্বাধীনতার মৌলিক নীতি, সাম্য জালিমের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহবান আল্লাহর কোরআন শরীফ, রাসুলের বাণী হাদীস শরীফে সুস্পষ্টভাবেই রয়েছে। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি সকল রাজনৈতিক দলগুলো থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন এবং হুকমাত রব্বানী "খোদারী খিদমতগার" প্রভৃতি ধর্মীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মওলানা তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের দাবি নিয়ে কখনো রাজনৈতিক আন্দোলনের সীমানা ও পরিধি নির্ধারণ করেন নি, এখানেই তাঁর কাছে ধর্মের পবিত্রতা ও রাজনৈতিক সততা। তিনি ধর্মীয় ওয়াজ মাহফিল করেন নি করেছেন কৃষক সম্মেলন, শ্রমিক সভা , মওলানা মসজিদ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান করেননি, করেছেন লড়াই সংগামের হাতিয়ার সেক্যুলার সংগঠন। এবাদাতের টুপির বদলে তিনি সংগ্রামের লাল টুপি পড়িয়েছিলেন। তসবিহ্র পরিবর্তে হাতে তুলে দিয়েছিলেন বাঁশের লাঠি। মুরিদদের বেহেশতের স্বপ্ন দেখানোর পরিবর্তে দীক্ষা দিয়েছিলেন অধিকার প্রতিষ্ঠার। সংগ্রামের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে দিয়ে সর্বাঙ্গ নিয়ে বাঁচার এবং ইহজগতকে শোষনমুক্ত রাজ্যে পরিনত করার। ধর্মগ্রন্থের মুখস্থ বুলির পরিবর্তে লিখিয়াছেন সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দাঁত ভাঙ্গা মন্ত্র উচ্চারণ, ধর্মের নামে রাজাকার আলবদর হওয়ায় বিপরীত প্রেরণা দিয়েছেন ধর্মনিরপেক্ষ চেতনায় মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার, এখানেই নামে মওলানা হয়েও তিনি মোল্লা ছিলেন না, ছিলেন সংগ্রামের প্রতীক ও মানবতার পথ প্রদর্শক।

এপ্রসংগে নকশালপন্থী কমিউনিষ্ট নেতা পাবনা কমরেড আলাউদ্দীন আহমদ এর একটি লেখার উদ্ধৃতি দেওয়া হলো: মওলানা ভাসানী ধর্মীয় রাজনীতির সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেছেন, এবং ধর্মীয় নেতা হওয়া সত্বেও জীবনের একটা সু-দীর্ঘ সময়ে কমিউনিষ্টদের সাথে কাজ করেছেন। পীর হওয়া সত্বেও তিনি সাম্প্রদায়িকতায় উর্ধ্বে ছিলেন, এবং বৃটিশ আমল থেকেই এই উপমহাদেশের সকল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামায় শান্তি স্থাপনে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছেন।

শুধু সাম্প্রদায়িকতা নয়, ধর্মীয় গোড়ামির বিরুদ্ধেও তাঁর কণ্ঠ সোচ্চার থেকেছে, তাঁর জীবদ্দশায় সকল প্রতিক্রিয়াশীল মহল থেকে নানা প্রকার কুৎসিত আক্রমন চলেছে এবং সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরে তিনি অনেক সময় একা হয়ে পরেছেন তবুও তিনি হাল ছাড়েন নি। কঠোর পরিশ্রমী এই বিতর্কিত জননেতা নিজের ধৈর্য অধ্যাবসায়, ও প্রজ্ঞার ফলে আবার নতুন সঙ্গী জড়ো করেছেন, সংগ্রাম মুহূর্তে আবার জনতাকে সাথে নিয়ে সামনের কাতারে এসে হাজির হয়েছেন।

আমাদের বর্তমান এই রাজনৈতিক সংকট কালে যদি আমরা মওলানা ভাসানীর জীবন ও সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং তাঁর আসাম্প্রদায়িক চেতনার নির্যাসটুকু হাতিয়ার হিসাবে মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী চেতনায় জাতিকে উজ্জীবিত করতে পারি তবেই মুক্তিযুদ্ধ চেতনা প্রতিষ্ঠার পথ গুগম হবে। আজো ভাসানী হোক শোষক ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের মুক্তি সংগ্রামের প্রেরণার উৎস।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় - ৮

তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষন।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা ভাসানী সম্পর্কে জানতে কিংবা তাঁর রাজনীতির মূল সুত্র অনুধাবন করার জন্য মূলত বিভিন্ন রাজনীতিবিদদের সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়েছে, যদিও তিনি আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা তথাপি আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা মওলানা ভাসানীর রাজনীতি বা তার রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল নন। কিন্তু বামপন্থী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে মওলানা ভাসানীর রাজনীতি ও রাজনৈতিক জীবন যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। রাজনীতিবিদরা ছাড়া অন্যান্য পেশার লোকজনের কাছে মওলানা ভাসানী কেবল মাত্র একজন রাজনৈতিক নেতা হিসাবে পরিচিত। কেউ কেউ তাঁর এই ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে ও আমাদের রাজনীতিতে তার অবদান সম্পর্কে জানলেও তাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। বেশীর ভাগ মানুষই তাঁকে সাধারণ একজন রাজনীতিবিদ হিসাবেই জানে। বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের কাছে তাঁর পরিচিতি বইয়ের লেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রকৃত পক্ষে মওলানা ভাসানীর রাজনীতির চর্চা আজ আমদের জন্য আবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর মত একজন রাজনীতিবিদের আদর্শকে সামনে রেখে আমাদের বর্তমান রাজনীতিবিদের সামনে এগিয়ে যাওয়া উচিত। আর তাই তারা কিংবা আমরা মওলানা ভাসানীকে কতটুকু জানি তা উপস্থাপন করার জন্য কিছু আবদ্ধ ও উন্মুক্ত প্রশ্ন তৈরী করা হয়। এবং প্রশ্নগুলো বিশ্লেষনের মাধ্যমেই ফুটে উঠবে মওলানা ভাসানী সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধি কিংবা আমাদের দৃষ্টিভংগী। নিম্নে প্রশ্নসমূহ উপস্থাপন ও বিশ্লেষন করা হলো।

আবদ্ধ প্রশ্নমালা

(১) মওলানা ভাসানী কেমন নেতা ছিলেন বলে আপনি মনে করেন ?

(i) ধর্মীয় নেতা (ii) রাজনৈতিক নেতা।

(২) মওলানা ভাসানীকে কেন আমরা রাজনৈতিক ক্ষমতায় দেখতে পাইনি ?

Dhaka University Institutional Repository

(i) তাঁর অযোগ্যতার কারণে বা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের অভাবে।

(ii) রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতি মোহহীনতার কারণে।

(৩) মওলানা ভাসানীর রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল।

(i) জনগনের কল্যাণ সাধন করা (ii)ধর্মকে ভিত্তি করে রাজনীতির চর্চা করা।

(৪) মওলানা ভাসানীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন বিশ্বমানের নেতা। কারণ-

(i) তাঁর নিজেস্ব যোগ্যতা, দক্ষতা ও দূরদর্শিতা প্রভৃতি গুণের কারণে।

(ii) সর্বত্র আপোষকামিতার কারণে।

(৫) আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে মওলানা ভাসানীর অবদান আছে বলে মনে করেন ?

(i) হ্যাঁ (ii) না।

(৬) মওলানা ভাসানী একাধিক রাজনৈতিক দল গঠন করেন কারণ-

(i) আদর্শের মিল না হওয়ার কারণে। (ii) ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য।

(৭) মওলানা ভাসানীকে কি আপনি একজন আন্তর্জাতিক মাপের নেতা মনে করেন?

(i) হ্যাঁ (ii) না।

(৮) নতুন প্রজন্মে কাছে মওলানা ভাসানী কতটা পরিচিত বলে মনে করেন?

(i) নামসর্বস্ব নেতা হিসাবে। (ii) আদর্শ রাজনৈতিক নেতা হিসাবে।

(৯) মওলানা ভাসানীর প্রবর্তিত ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় কি আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় মনে করেন?

(i) হ্যাঁ (ii) না।

Dhaka University Institutional Repository

(১০) মওলানা ভাসানী ছিলেন মজলুম জননেতা। তিনি কি জনগনের শোষণমুক্তির জন্য কিছু করতে পেরেছেন ?

(i) হ্যাঁ (ii) না।

উপরোক্ত প্রশ্নমালা সমূহ বিভিন্ন জনকে প্রশ্ন করে যে সব তথ্য পাওয়া যায় সেগুলো নিম্নে বিশ্লেষন করা হলো -

প্রথম প্রশ্নটির ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ উত্তরদাতা তাকে রাজনৈতিক নেতা হিসাবে আখ্যায়িত করলেও কেউ কেউ তাকে দুটো বিষয়ের সমন্বয়ক নেতা হিসাবে দেখেছেন। কারন তাঁর বেশভুষায় ছিল মূলতঃ ধর্মীয় একটা ছাপ বা আবরন। অনেকে মনে করেন যদিও তিনি রাজনৈতিক নেতা হিসাবে পরিচিত তথাপিও তিনি তাঁর রাজনীতিতে ধর্মকে সম্পৃক্ত করতে চেয়েছিলেন, যেহেতু তিনি ছিলেন মজলুম নেতা সেহেতু জনগনের জন্য ধর্মীয় অনুশাসনের উপর ভিত্তি করে তাদের অধিকার আদায় করতে চেয়ে ছিলেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে উত্তরদাতার সকলে একমত ছিলেন কারণ মওলানা ভাসানীর পরিচয় সকলের কাছেই এক অর্থাৎ সকলেই তাকে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতি মোহহীন হিসাবে জানেন। তাঁর রাজনীতি জনগনের জন্য নিজের জন্য নয়। তিনি চেয়েছিলেন জনগনের অবস্থার পরিবর্তন। নিজের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য তিনি রাজনীতি করেন নি।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে দেখতে পাই সকলেই মনে করেন তাঁর রাজনীতির উদ্দেশ্য জনগনের কল্যাণ সাধন। তথাপিও কারো কারো মতে ইসলামী দর্শনের উপর ভিত্তি করে জনগনের জীবনকে তাদের চাওয়া পাওয়াকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন এবং প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন ইসলামী শাসন ব্যবস্থা।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ প্রশ্নের ক্ষেত্রে সকলেই একমত পোষন করেন, মওলানা ভাসানী এমনি একজন রাজনৈতিক নেতা যার মধ্যে নেতৃত্বের গুনাবলীর সকল বিষয়গুলোই পরিলক্ষিত হয়। কয়েকজন উত্তরদাতার মতে তিনি মানুষের মনের কথা বুঝতে পারতেন যা কিনা সাধারনত অন্যান্য নেতাদের গুনের মধ্যে দেখা যায়না আর এই সমস্ত গুনাবলীর কারনেই তিন এতবড় মাপের একজন নেতা হতে পেরেছেন একাডেমিক শিক্ষাব্যতীত।

পঞ্চম প্রশ্নের সকল উত্তরদাতাই একমত পোষন করেন যে, আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে মওলানা ভাসানীর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তরদাতারা মনে করেন মওলানা ভাসানী তাঁর রাজনীতির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সফল করার লক্ষ্যেই একাধিক রাজনৈতিক দল গঠন করেন। তাঁর গঠিত রাজনৈতিক দলে যখনই তাঁর আদর্শের সাথে দলের অমিল দেখতে পান তখনই তিনি সেই দল ত্যাগ করে নতুন দল গঠন করেন কেবল মাত্র তাঁর আদর্শ এবং লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য।

সপ্তম প্রশ্নে উত্তরদাতারা সকলেই তাঁকে একজন বড় মাপের নেতা হিসাবে মত প্রদান করেন। তিনি অবশ্যই আন্তর্জাতিক নেতার সাথে সমতুল্য।

অষ্টম প্রশ্নে উত্তরদাতারা মনে করেন নতুন প্রজন্মের কাছে মওলানা ভাসানী মূলতঃ নাম সর্বস্ব নেতা কেননা তারা কেবল মাত্র তাঁকে রাজনৈতিক নেতা হিসাবেই চেনে। যেহেতু আমাদের দেশে সত্যিকার রাজনীতির ইতিহাস চর্চা কম হয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ইতিহাস বিকৃতির প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। তাই নতুন প্রজন্ম আজ বিভ্রান্ত। সঠিক সত্যটা যাচাই করতে পারছে না । সঠিক রাজনৈতিক ইতিহাস চর্চা করা না হলে এই সমস্ত নেতাদের মূল্যায়ন আশা করা যায় না। আমাদের দেশের রাজনীতির জন্য, জনগনের জন্য মওলানা ভাসানী কি করেছেন বা কি করতে চেয়েছেন তা

Dhaka University Institutional Repository

সঠিক ভাবে জানতে পারলে মওলানা ভাসানী অবশ্যই নতুন প্রজন্মের কাছে একজন আদর্শ রাজনৈতিক নেতা হিসাবে পরিগনিত হবে।

নবম প্রশ্নে দেখা যায় বেশি ভাগ উত্তরদাতাই তাঁর প্রবর্তিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ মওলানা ভাসানী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ঝাপসা ধারনা পোষণ করলেও মওলানা ভাসানী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সত্যিকারের আদর্শ বা স্বপ্ন সম্পর্কে তাঁরা কিছুই জানে না। অর্থাৎ মওলানা ভাসানী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হিসাবে গণ্য করা যায়।

দশম প্রশ্নে উত্তরদাতারা বলেন মওলানা ভাসানী অবশ্যই মজলুম জননেতা। তাঁর রাজনীতির মূল উদ্দেশ্যই ছিল জনগণের সেবা করা এবং আমৃত্যু তিনি তাই করে গেছেন। এমনকি মৃত্যুর পরেও তাঁর এই চাওয়াকে বা আদর্শকে বাস্তবায়নের জন্য আহ্বান জানিয়ে গেছেন পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। তাঁর একমাত্র আপসোস ছিল তিনি মৃত্যুর আগে জনগণের সত্যিকারের মুক্তি অর্থাৎ অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক মুক্তি দেখে যেতে পারলেন না।

উন্মুক্ত প্রশ্নাবলী

সাক্ষাতকারের এই পর্বে উত্তরদাতাদের জন্য কিছু উন্মুক্ত প্রশ্নাবলী রাখা হয় যাতে করে তারা নিজেদের মতো করে উত্তর দিতে পারে। অর্থাৎ নিজেদের মতামত ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে কোন সীমাবদ্ধতা না রেখে তাদের সম্পূর্ন স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। প্রশ্ন গুলো নিম্নরূপ-

১। মওলানা ভাসানীর রাজনীতি কি প্রকৃতির ছিল বলে আপনি মনে করেন ?

২। "একজন রাজনীতিবিদ হিসাবে তিনি ছিলেন ব্যর্থ"- আপনি কি তা মনে করেন?

Dhaka University Institutional Repository

৩। আমাদের রাজনীতিতে কিংবা আমরা কি মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক আদর্শের মূল্যায়ন করছি ?- আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

৪। মওলানা ভাসানীর সাথে আমাদের বর্তমান রাজনীতিবিদদের কোন পার্থক্য আছে কি ?- পার্থক্য থাকলে তা কোথায় এবং কতটুকু বিশ্লেষন করুন।

৫। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে মওলানা ভাসানীর ভুমিকা কতটুকু বলে আপনি মনে করেন ?

৬। মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক দল বর্তমান রাজনৈতিক অংগনে কতটুকু কার্যকর ভুমিকা রাখছে ?

৭। মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক দলে মওলানা ভাসানীর আদর্শগুলো বাস্তবায়নে কতটুকু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করেছে বলে মনে করেন ?

৮। মওলানা ভাসানী কি ধর্মীয় অনুশাসন গুলো ব্যবহার করে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার বা রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রন করতে চেয়েছিলেন ?

৯। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকট পরিস্থিতিতে মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক দর্শন কি কোন ভুমিকা রাখতে পারে বলে আপনি মনে করেন ?

১০। "মওলানা ভাসানীর মত একজন রাজনৈতিক নেতা- বর্তমান রাজনৈতিক অংগনে বড় বেশী প্রয়োজন"- আপনি কি এই বক্তব্যের সাথে একমত ?

উপরোক্ত উন্মুক্ত প্রশ্নাবলী গুলো উত্তরদাতাদের কাছ থেকে বিভিন্ন দৃষ্টি ভংগীর বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহে সহায়ক হয়েছে। এই সমস্ত তথ্য গুলো বিশ্লেষন করে মওলানা ভাসানী সম্পর্কে তাদের মতামত সুন্দর ভাবে ফুটে উঠে।

প্রথম প্রশ্নের ক্ষেত্রে সকলেরই মত তাঁর রাজনীতি ছিল জনকল্যাণ মূলক আর তাই তিনি ছিলেন মজলুম নেতা।

দ্বিতীয় প্রশ্নটা কিছুটা বিতর্কের অবতারনা করে এই প্রশ্নে রাজনীতিতে সফলতা ব্যর্থতার মাপকাঠি একেক জনের কাছে একেক রকম। কেবল মাত্র ক্ষমতা গ্রহন কিংবা ক্ষমতার চর্চা করাইতো রাজনীতির বা রাজনীতিবিদের সফলতা নয়। মওলানা

Dhaka University Institutional Repository

ভাসানী কখনোই ক্ষমতায় জাননি বা ক্ষমতার জন্য লালায়িত হন নি। তথাপিও তিনি একজন পরম অনুকরণীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর রাজনীতি ছিল শাসকের বিরুদ্ধে আর আমৃত্যু তিনি তা করে গেছেন। তিনি তাঁর কর্মের পুরস্কার পেয়েছেন জনগণের কাছ থেকে। অতএব তাঁকে ব্যর্থ রাজনীতিবিদ বলতে কেউই রাজী হননি।

তৃতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ উত্তরদাতাই মওলানা ভাসানীর সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছেনা বলে মত প্রকাশ করেন। তবে কেহ কেহ মনে করেন কিছুটা হলেও তাঁর মূল্যায়ন হচ্ছে বা করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

চতুর্থ প্রশ্নটির ক্ষেত্রে সকলেই এক মত প্রকাশ করেছেন যে, আমাদের বর্তমান রাজনীতিবিদদের সাথে তাঁর কোন তুলনাই হয়না। তিনি ছিলেন অন্য রকম একজন নেতা । যার সাথে অন্যদের তুলনা চলেনা। নেতৃত্বের গুনাবলী বলতে যা বুঝায় তার সব গুলোই ছিল মওলানা ভাসানীর মধ্যে কিন্তু বর্তমান রাজনীতিবিদদের চরিত্রে নেতৃত্বের গুনাবলী খুজেঁ পাওয়া সত্যিই কষ্টকর । তাই মওলানা ভাসানীর সাথে বর্তমান রাজনীতিবিদদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান।

পঞ্চম প্রশ্নে দেখা যায় কারো কারো মতে আমাদের স্বাধীনতার নির্মাতা মওলানা ভাসানী। প্রত্যক্ষ ভাবে দেখা না গেলেও পরোক্ষ ভাবে তাই। স্বাধীনতা অর্জনের যে ভিত্তি তা মূলতঃ মওলানা ভাসানীর স্থাপনা। পাকিস্তান সময় থেকেই মওলানা ভাসানীর দাবী ছিল স্বায়ত্ব শাসন, স্বাধীনতা। এবং এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তিনি আন্দোলন করেছেন। তাই স্বাধীনতা যুদ্ধে মওলানা ভাসানীর অবদানকে ছোট করে দেখার কোন মানে হয় না । তবে কেউ কেউ মনে করেন পরিবেশ পরিস্থিতি ভাসানীর অনুকূলে না থাকায় মওলানা ভাসানী স্বাধীনতা আন্দোলনে তেমন কোন ভুমিকা রাখতে পারেনি।

ষষ্ট এবং সপ্তম প্রশ্নে উত্তরদাতার একই মত প্রকাশ করে তাদের মতে সর্বশেষ মওলানা ভাসানীর গঠিত রাজনৈতিক দল ন্যাপ বর্তমান রাজনৈতিক অঙ্গনে তেমন

Dhaka University Institutional Repository

কোন ভুমিকাই রাখতে পারছেনা। বরং ভাসানীর নাম ভেঙ্গে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহন করছে। মওলানা ভাসানীর যে আদর্শ ও লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে রাজনৈতিক দলগঠন করেছিলেন তা পূরণ করতে সম্পূর্ন ভাবে ব্যর্থ তাঁর রাজনৈতিক দল।

অষ্টম প্রশ্নে দেখা যায় সকলেই মওলানা ভাসানীকে একজন ধর্ম নিরপেক্ষ নেতা হিসাবে আখ্যায়িত করেন। তবে তিনি মানুষের মন মানসিকতা বুঝতে পারতেন এবং যেহেতু আমদের দেশের মানুষের মধ্যে ধর্মের প্রভাবটা একটু বেশী তাই অনেক সময় জনগনের অধিকার আদায়ের বিষয় গুলো ধর্মীয় অনুশাসনের সাথে মিলিয়ে জনগনের সামনে উপস্থাপন করতেন। ফলে তা জনগনের কাছে বেশী গ্রহনযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হত। ধর্মীয় গোড়ামী কুসংস্কার গুলো নয় ধর্মের সত্য সুন্দর, ন্যায্য বিষয়গুলোকে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেছেন।

নবম প্রশ্নে উত্তরদাতারা মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক দর্শনকে সর্ব সময়ের জন্য আর্দশ বলে বর্ননা করেছেন। কেননা মওলানা ভাসানীর দর্শন মানেই হল শোষিতের দাবী অধিকার আদায়ের, জনগনের সুখ স্বাচ্ছন্দের দর্শন। রাষ্ট্রে শাসক শোষিত শ্রেণী থাকবেই তবে শাসক যেন জনগনের অধিকার হরণ করতে না পারে। স্বেচ্ছাচার করতে না পারে সেই কথাই বলে মওলানা ভাসানীর দর্শন। রাজনীতি যেন কেবলমাত্র জনগনের কল্যাণের উদ্দেশ্যই চর্চা করা হয় রাজনীতিবিদদের লক্ষ্য একমাত্র উদ্দেশ্যই যেন হয় জনগনের সকল স্থরয়ের নাগরিকদের সেবা প্রদান করা। নিজের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে জনগনের স্বার্থকে যেন বড় করে দেখা হয় রাজনীতিবিদদের কাজ যা মওলানা ভাসানী নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন। তাই এক কথায় বলা যায় এই দর্শনই একমাত্র আদর্শ দর্শন আমাদের জন্য।

দশম প্রশ্নের উত্তরে সকলেই বর্তমান রাজনীতিবিদদের কুৎসিত চরিত্রকে ঘৃনা প্রদর্শন করে। কারণ আজকের রাজনীতিবিদ মানেই মিথ্যাবাদী, প্রতারক দূর্নীতিপরায়ন, অসৎ, ধূর্ত ইত্যাদি বদগুনের সমাহারের চরিত্রই আমাদের সামনে ভেসে উঠে যা কখনই কোন রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর হতে পারেনা। রাজনীতিবিদরাই তাদের

Dhaka University Institutional Repository

যোগ্যতা দক্ষতা, মেধা পরিশ্রম দিয়ে দেশকে সামনের দিকে নিয়ে যায় অতএব তাদের চরিত্র কখনই যেন অসৎ চরিত্রের না হয়। এমন রাজনীতিবিদরা জনগনের কাছে কখনই গ্রহনযোগ্যতা পাবেনা। অতএব, বর্তমান রাজনৈতিক সংকটকালে অবশ্যই মওলানা ভাসানীর মত সৎ রাজনৈতিক নেতার প্রয়োজন বড় বেশী। তাই আমাদের নেতাদের উচিৎ তাঁকে আদর্শ হিসাবে গ্রহন করে রাজনীতির চর্চা করা এবং দেশের জনগনের মুক্তির জন্য কাজ করে যাওয়া তবেই আমরা কাঁটাতে পারবো আমাদের এই রাজনৈতিক সংকটকে। আর এটাই আমাদের সকলের কাম্য।

গবেবনার ফলাফল ঃ-

বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনে অনেক উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দ বিদ্যমান। কিন্তু তাদের মধ্যে সম্পূর্ন নিঃস্বার্থ ভাবে রাজনীতি করেছেন হাতে গোনা মাত্র কয়েক জন রাজনীতিবিদ তাদের মধ্যে মওলানা ভাসানী অন্যতম। এই গবেষণায় এটাই বিশ্লেষন করে দেখা হয়েছে যে, মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন আমাদের রাজনীতিতে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করে আছে এবং কতটুকু ভুমিকা রেখেছে। গবেষনা কর্মের এই অংশে গবেষণার ফলাফল সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো -

এই গবেষণা কার্যটি বিজ্ঞান ভিত্তিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য গবেষণার শুরুতে কয়েকটি অনুমান গঠন করা হয়েছিল যা প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন এই সমস্ত অনুমান গুলোর যথার্থতা বিশ্লেষন করে দেখা হবে। এই গবেষনার প্রথম অনুমানটি হচ্ছে- মওলানা ভাসানী ছিলেন মজলুম জননেতা। এই গবেষনার জরিপে দেখা যায় ৯৯.৯৯% ব্যক্তিই তাকেই মজলুম নেতা হিসাবে মানেন। তবে যারা মানেন না অর্থাৎ তাদের কাছে মওলানা ভাসানী নাম সর্বস্ব নেতা। অতএব, গবেষণার এই অনুমানটি সঠিক।

এই গবেষণার দ্বিতীয় অনুমানটি ছিল- মওলানা ভাসানী ছিলেন ধর্ম নিরপেক্ষ নেতা। এক্ষেত্রে জরিপে দেখা যায় ১০% ব্যক্তি তাকে ধর্মীয় নেতা হিসাবে মনে করেন তবে ৯০% ব্যক্তি তাকে ধর্ম নিরপেক্ষ নেতা হিসাবে গণ্য করেন। প্রকৃত পক্ষে, পোষাক পরিচ্ছেদে মওলানা ভাসানীর মধ্যে একটি ধর্মীয় আবরণ ছিল যার কারণে অনেকেই

Dhaka University Institutional Repository

তাকে রাজনৈতিক নেতার পরিবর্তে ধর্মীয় নেতা হিসাবে গণ্য করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করতেন। তবে তিনি ছিলেন সত্যিকারের একজন ধর্মনিরপেক্ষ নেতা। কখনই তিনি শ্রেণী ভেদাভেদ করেননি তাঁর রাজনীতি ছিল সকলের জন্য। কাজেই এই অনুমানটি সঠিক। এই গবেষনার তৃতীয় অনুমানটি ছিল- তিনি সারা জীবন বিরোধী দলে অবস্থান করেছেন। জরিপের ফলাফলে দেখা যায় ৯৯% উত্তরদাতা মনে করেন তিনি জনগনের স্বার্থরক্ষার জন্যই সারা জীবন বিরোধী দলে অবস্থান করেন। তিনি ব্যক্তি স্বার্থকে উপেক্ষা করে জনগনের স্বার্থকেই সর্বদা বড় করে দেখেছেন। কাজেই এই অনুমানটিও সঠিক।

এই গবেষণার চতুর্থ অনুমান ছিল - নেতৃত্বের গুনাবলীর সকল বিষয়গুলো তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। জরিপে দেখা যায় ৯৮% উত্তরদাতা মনে করেন মওলানা ভাসানীর মত নেতা আজ আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে অনুপস্থিত। তাঁরা মনে করেন নেতৃত্বের গুনাবলীর সমাহার ছিল মওলানা ভাসানীর চরিত্রে তাই আজকের রাজনীতিবিদের তাঁকে অনুকরণ ও অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন। অতএব এই অনুমানটিও সঠিক।

এই গবেষণার শেষ অনুমান ছিল - মওলানা ভাসানীর রাজনীতি ছিল আদর্শ রাজনীতি। জরিপে দেখা গেছে ৯৬% উত্তরদাতা মনে করেন মওলানা ভাসানী সারা জীবন রাজনীতি করে গেছেন জনগনের সুখ শান্তি আর মুক্তির জন্য আর এই রাজনীতিই হচ্ছে আসল রাজনীতি। তাই মওলানা ভাসানীর রাজনীতি অবশ্যই ছিল আদর্শ রাজনীতি। কাজেই শেষ অনুমানটিও সত্য বলে প্রমাণিত।

পরিশেষে এই গবেষণার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, “মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন” বিশ্লেষন গবেষণাটি সর্বিক ভাবে মওলানা ভাসানীর পরিপূর্ন রূপ। এতে আজকের রাজনৈতিক সংকটকালে একজন রাজনীতিবিদ ও রাজনীতি কিভাবে পরিচালিত হলে সংকটকে কাটিয়ে উঠতে পারবে তারই দিক নির্দেশনা।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় - ৯

উপসংহার।

Dhaka University Institutional Repository

"মওলানা ভাসানী তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে একজন অসাম্প্রদায়িক, স্বাধীনচেতা, গণতান্ত্রিক যোদ্ধা ছিলেন। তিনি পথিকৃত ছিলেন শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার। মওলানা সাহেবের রাজনৈতিক অঙ্গনটা ছিল একটা ট্রানজিট ক্যাম্পের মত। এখানে সবাই আসত এবং প্রয়োনজনটুকু গ্রহন করে আবার চলে যেত।"[১]

মওলানা ভাসানী দেশের ও জাতীর সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে বের করতে তাঁর শুধু আগ্রহই ছিল না, ছিল ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টা। দীর্ঘ আয়ু যেন তিনি পেয়েছিলেন অপরিমেয় কাজ করার জন্যই। বিচিত্র রকমের এত অজস্র কাজে যার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল রাজনীতি, তিনি নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন যার তুলনা বিংশ শতকের বিশ্বে বিরল। ইসলামের সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্য মৈত্রীর মূলনীতির প্রতি তাঁর অবিচল আস্থার কারণেই তিনি একজন ধর্মীয় নেতা হওয়া সত্ত্বেও সংস্কারমুক্ত মনেই নিজেকে নিবেদন করেন নিপীড়িত বঞ্চিত পদানত মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কর্মক্ষেত্ররূপে বেছে নেন রাজনীতিকেই। তাঁর স্বদেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষন না থাকলে, সমাজে সামন্তবাদী শোষন না থাকলে সম্ভবতঃ ভাসানীরও সার্বক্ষনিক রাজনীতিতে নিয়োজিত হওয়ার প্রয়োজন হতো না । কারন ঐকালে প্রথাগত ভাবে রাজনীতি করা হয় শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া অথবা ক্ষমতায় অংশ গ্রহন করার লক্ষ্যেই, কিন্তু ভাসানীর রাজনীতি ছিল শাসন ক্ষমতার সংগে সম্পর্কশূণ্য।

(১) আজকের কাগজ- শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী- হুমায়ুন কবীর,ঢাকা, রোববার, ৩ অগ্রাহায়ন।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের বন্যা সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তিনি অব্যাহতভাবে চাপ দিয়েছেন সকল সরকারকে। ৫০-এর দশক থেকে তিনি অবিরাম 'ক্রুগ মিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য' সরকারের কাছে দাবি জানাতেন। পরপর কয়েক বছর বন্যার পর ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান সরকার একটি বন্যা কমিশন গঠন করেন 'ক্রুগ মিশন' বলে পরিচিত। জাতিসংঘের কারিগরী সহায়তা মিশন এ দেশের বন্যার প্রধান কারন ইত্যাদি নিয়ে অনুসন্ধান করে ১৯৫৭ সালে এক রিপোর্ট প্রণয়ন করে। এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই গঠিত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। (ই,পি ওয়াপদা) ভাসানীর এ ধারনা একেবারে বদ্ধমূল ছিল যে, ক্রুগ মিশন ও অন্যান্য মিশনের সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের বন্যার সমস্যা সমাধান হতে পারত। ১৯৬২ সালেই প্রকাশ করেন তিনি 'দেশের সমস্যা ও সমাধান' নামক একটি পুস্তিকা যেখানে বন্যাসহ নানা বিষয় প্রাধান্য পায়।

বাঙালীর ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে ভাসানীর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল আগাগোড়াই অতি স্পষ্ট, অখন্ড ও সংশয়হীন। নিজের প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাছিল অতি অল্প, কিন্তু বাঙালীর সৃষ্ট সাহিত্য, সঙ্গীত, দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি উৎকর্ষ অর্থাৎ তার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রশ্নে তিনি ছিলেন সংশয় ও সংকীর্নতার উর্ধ্বে। বাঙালী নেতাদের মধ্যে যাঁরা ব্যক্তিস্বার্থের কাছে জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে জাতির ক্ষতিসাধন করেছেন তাদের প্রতি ছিল তার অশেষ ঘৃণা। বাঙালীর অপরাজেয় শক্তিতে তার ছিল অপার আস্থা তিনি বলেছেন ঃ "জাতি হিসাবে বাঙালী বাঁচিয়া থাকিবার শক্তিও আছে অধিকারও আছে। সম্পদশালী ঐতিহ্য তাহার চলার পথের শ্রেষ্ঠ পাথেয়। ব্যক্তি বিশেষ বা দল বিশেষের স্বার্থপরতা, জাতীয় প্রগতি ব্যাহত করিতে পারে সত্য, কিন্তু উহার মাশুল একদিন তাহাকেও দিতে হইবে ষোল আনায়। সুদে-আসলে বাঙালী তাহার প্রতিশোধ নিবেই"।[১]

(১) আজকের কাগজ- শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী- হুমায়ুন কবীর,ঢাকা, রোববার, ৩ অগ্রাহায়ন।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য ও গতানুগতিকতার অবসান চেয়েছেন তিনি। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন আজকাল মাদ্রাসা শিক্ষা বলতে যা বুঝায় ইসলামী শিক্ষা তা নয়। তাই তিনি বলেন তার পরিকল্পিত " ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে কেন সম্ভবত পৃথিবীর যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পৃথক ধরনের হইবে।" পরিতাপের বিষয়, তিনি তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুযোগ পাননি। এ'ব্যাপারে শাসকগোষ্ঠী ও তাঁর জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরে তাঁর সঙ্গে প্রতারনা করেছে। তাঁকে কথা দিয়ে কেউ কথা রাখেনি।

ভাসানী নিজে ছিলেন একজন ধর্মীয় নেতা, কিন্তু তিনিই ছিলেন ধর্মপন্থী রাজনীতিকদের ত্রাস। পাতিবুর্জোয়া রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তাঁর নীতিগত বিরোধ ছিল, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে তাঁর বৈরিতা ছিলনা । বরং বহুক্ষেত্রে তাদের সংগে তিনি একত্রে আন্দোলন করেছেন। কিন্তু প্রাচীনপন্থী ধর্মান্ধ রাজনীতির তিনি ছিলেন ঘোর শত্রু। তাঁর জীবদ্দশায় বাংলাদেশে ধর্মপন্থী রাজনীতি বিকশিত ও শক্তিশালী হতে পারেনি। জামাতে ইসলামীকে অন্য অনেকেই ক্ষমা করলেও তিনি ক্ষমা করতে পারেন নি।

আমাদের দেশে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় যে, নেতৃত্ব নিয়ে কলহ করে দল দ্বিখন্ডিত ত্রিখন্ডিত হয়ে যায় - দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে নেতারা গঠন করেন নতুন দল। কিন্তু ভাসানীর ক্ষেত্রে কখনোই তেমন হয়নি। নেতৃত্বের জন্য নয়, নীতিগত কারনে তিনি দল ত্যাগ করেছেন। তিনি সংগঠন বিরোধী বলে যে অপখ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁর সমর্থক অসমর্থক অনেকের দ্বারা তা যথার্থ নয়। প্রকৃতপক্ষে দলত্যাগ করেছেন তিনি স্রেফ আদর্শের জন্য। তাঁর প্রতিপক্ষের এই অভিযোগ তাঁর কানে গেছে এবং প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছেন- "আমার বিরুদ্ধবাদীরা এমনকি রাজনীতি সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা করেন না এইরুপ সরল ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন ভসানী বারবার দল পরিবর্তন আর দল ত্যাগ করেন। কিন্তু আমার সমালোচক বন্ধুরাই বোধ হয় একটিবারও ধীরভাবে ভাবিয়া দেখেন নাই যে, ভাসানীর সত্যিকারের নীতি কি? একটু গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিলে তাহাদের বুঝিতে মোটই কষ্ট হয় না যে, ভাসানী

Dhaka University Institutional Repository

নীতির স্বার্থে বারবার দলত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু সংকীর্ন স্বার্থে একটিবারও নীতি ত্যাগ করে নাই।”[১]

কোন মানুষই ভুলভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। ভাসানীও ছিলেন না কিন্তু ক্রুটি ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন বন্ধন মুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম ব্যক্তিত্ব। কোন মতবাদ, কোন মহাক্ষমতাবান ব্যক্তি বা কোন শক্তির প্রতি তাঁর শর্তহীন আনুগত্য ছিল না। তাঁর মত বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব উপমহাদেশের রাজনীতিতে আর একজনও নেই। দু'বছর আগে যারা তাঁর পশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন, দু'বছর পরেই তারা তাঁর নিন্দা প্রচারে অপরিমেয় শক্তি ক্ষয় করেছেন। নিঃসন্দেহে তাঁর সম্পর্কে বলা যায়- তিনি জীবদ্দশায় যেমন ছিলেন তেমনি মৃত্যুর পরও থাকবেন একাধারে অবিসংবাদিত ও বিতর্কিত, নন্দিত ও সমালোচিত, পূজিত ও অবহেলিত।

মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বের বহুবিধ গুন ও বৈশিষ্টের মধ্যে সংক্ষেপে এগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ

ক) তাঁর জীবনের শেষ চার দশকে তিনি দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নায়ক অথবা অন্যতম নায়কের ভুমিকা পালন করেন। এই বিরল কৃত্বিতে তাঁর সমসাময়িক আর কোন বাঙালী নেতা অর্জন করতে পারেনি।

খ) অনেকটা অলৌকিক দূরদর্শিতা ছিল তাঁর। কোন ঘটনা ঘটার অনেক আগেই তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করতে পারতেন যে এই পরিস্থিতির কারনে এই হতে যাচ্ছে। শুধু পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়াই নয় আশির দশকেই যে সো!ভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাবে সে ভবিষ্যৎ বাণীও তিনি অনবরত করতেন। অথচ ইউরোপীয় সোভিয়েত বিরোধী বুদ্ধিজীবীদের কেউ স্বপ্নেও ভাবেননি যে, এ সম্রাজ্যের পতন ঘটবে।

(১) ভাসানী পৃষ্ঠা ২৫৯ ন্যাপের রংপুর সম্মেলন ৩০শে নভেম্বর ১৯৬৭ এর ভাষণ।

Dhaka University Institutional Repository

গ) কোন ইস্যুতে জনমত সৃষ্টিতে তাঁর অপার দক্ষতা ছিল। সামাজিক, রাজনৈতিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জনসাধারনকে উত্তেজিত করে তুলতে পারতেন। মানুষের আবেগকে উত্তেজনায় পরিণত করতে পারতেন।

ঘ) সামজিক দ্বন্দ ভালোমত উপলব্ধি করার ক্ষমতা ছিল তাঁর । শাসক-শোষক, ধনী- দরিদ্র, জোতদার ও দরিদ্র কৃষক বা খেতমজুরদের মধ্যকার সম্পর্ক সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি ছিল নির্ভূল ও গভীর।

ঙ) তিনি কমিউনিষ্ট ছিলেন না, মার্কসবাদী ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন সমাতন্ত্রের একজন অবিচল প্রবক্তা মুসলমান প্রধান বাংলাদেশে তিনি ১৯৪৭ উত্তরকালে বিপ্লবী তথা সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তোলেন। এক্ষেত্রে তিনি অদ্বিতীয়।

চ) আন্দেলনের নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন তিনি। হরতাল ইত্যাদির সংগে যোগ করেছেন অনশন, ঘেরাও আন্দোলন, জ্বালাও-পোড়াও, লংমার্চ প্রভৃতি। তা'ছাড়া তাঁর ছিল উপস্থিত বুদ্ধি। যেমন, মিছিল নিয়ে বেরিয়েছেন পুলিশ বাঁধা দিচ্ছে, হয়তো নামাজের সময়ও আসন্ন, তিনি হিন্দু -মুসলমান প্রমুখ সমর্থকদের নিয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন নামাজে। নামাজ পড়ে শুরু করতেন মোনাজাত। সে নামাজের ভাবা পরলৌকিক সুখ-শান্তির জন্য নয়, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক অর্থাৎ ইহজাগতিক।

ছ) শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসারে উদ্যোগ গ্রহন করেছেন তিনি। রাজনীতির সঙ্গে শিল্পী, সাহিত্যিক-শিক্ষাবিদদের সম্পৃক্ত করেছেন।

জ) ব্যক্তিগত আরামের ব্যপারে ভ্রুক্ষেপ করেননি। সরল জীবন যাপনের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন।

ঝ) বিবৃতি-নির্ভর রাজনীতি না করে দৈহিক পরিশ্রমনির্ভর রাজনীতির প্রবর্তন করেন। দেশের এপ্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে হোক, নৌকায় হোক, ট্রেনে হোক-ঘুরে ঘুরে জনসংযোগ স্থাপন করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

ভাসানীর সীমাবদ্ধতা, ব্যর্থতা ও ত্রুটির দিকগুলো উল্লেখিত না হলে তাঁকে সামগ্রিকভাবে জানা যাবে না, তাঁর মূল্যায়ন হবে খন্ডিত, সেগুলো এ-রকম ঃ

ক) স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তিনি আপসহীন সংগ্রাম করেছেন। গনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সংহত করতে যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন প্রয়োজন তা তাঁর ছিল না। অতি অল্প সময়ে অনেক বেশী কাজ করিয়ে নেবার জন্য ব্যাকুল হতেন তিনি। এবং তাঁর নিজের দলের সরকারও সামান্য গণবিরোধী কাজ করলে কঠ্যের সমালোচনা করতেন প্রকাশ্যেই।

খ) সরকারের ইতিবাচক চেয়ে নেতিবাচক ও বিরুপ সমালোচনায় তিনি মুখর থাকতেন। নিজের দলের সরকারকেও সমালোচনা করেছেন, অন্য দলের সরকারকেও। ১৯৪৭ পরবর্তীকালে তিনি এদেশের একজন রাষ্ট্রগুরুতে পরিণত হন। সকল সরকার তাকে সমীহ করতেন, তাঁকে মর্যাদা দিতেন, কিন্তু তাঁর সকল সমালোচনাই যে সংগত ও যথার্থ ছিল তা, বলা উচিৎ হবে না । অব্যাহত সমালোচনায় সরকার ধীরস্থিরভাবে কাজ করতে পারে না, বিশেষ করে নতুন গণতান্ত্রিক দেশে।

গ) সমাজতন্ত্রের বাণী তিনি দেশের প্রতিটি গ্রামের দরিদ্র ও শ্রমজীবি মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, কিন্তু সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে দক্ষ কর্মীবাহিনী তৈরি করা দরকার তা করেননি, দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলো, যাদের পক্ষে প্রকাশ্যে কাজ করা সম্ভব ছিল না, তাদের হয়ে তিনি কাজ করেছেন, কিন্তু সবগুলো কমিউনিষ্ট দল উপদল ও সমাজ তন্ত্রের প্রতি সহানুভূতিশীলদের একত্রিত করতে তিনি ব্যর্থ হন।

ঘ) বারবার তিনি দল গঠন করেছেন এবং অল্প দিনেই সেই দলকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে নিয়ে গেছেন, তারপর কোন ইস্যুতে অন্যান্য নেতার সঙ্গে মত পার্থক্য হওয়ায় দলকে তিনি প্রতিপক্ষের হাতে ছেড়ে দিয়ে তিনি নিজে নিস্ক্রয় হয়ে পড়েন। সেটা ১৯৪৯ এ হয়েছে, ১৯৫৭তে হয়েছে, ১৯৬৭তে হয়েছে, তারপরও হয়েছে। যদিও এ প্রসংগে তার

Dhaka University Institutional Repository

বক্তব্য হল নীতিগত কারণেই তিনি দল ছেড়েছেন, অন্য কোন কারনে নয়। নীতির প্রশ্নে তার পক্ষে আপষ করা সম্ভব হতো না । অথচ সংসদীয় রাজনীতিতে আপোষের প্রয়োজন হয় কখনও কখনও।

ঙ) তাঁর সহকর্মীদের অনেকের অভিযোগ, দলীয় নেতা হয়েও অধিকাংশ সিদ্ধান্ত তিনি একা গ্রহন করতেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার আগে তিনি কদাচিৎ দলের নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের পরামর্শ নিয়েছেন। জনসভায় বক্তৃতার মধ্যে অথবা হঠাৎ এক বিস্ফোরক বিবৃতি দিয়ে তিনি তাঁর কর্মসূচী ঘোষনা করেছেন। যেমন, উদাহরন দিয়েছেন কেউ কেউ ১৯৭৫ এর কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন, ১৯৬৮ তে গভর্নর হাউজ ঘেরাও-এর কর্মসূচী, ১৯৬৯ এর জ্বালাও পোড়াও আন্দোলন, ১৯৭০ এর জ্বলোচ্ছাস উপদ্রুত এলাকা থেকে ফিরেই স্বাধীনতার এক দফা ঘোষনা ইত্যাদি। এগুলো কোন দলীয় সিদ্ধান্ত ছিলনা। তাঁর নিজের একার সিদ্ধান্ত ছিল। অন্যদিকে তিনি এক বা একাধিক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, দলের নেতাদের সংগে পরামর্শ করতে গেলে সভায় তর্ক বিতর্কের নিচে চাপা পড়ে যেতো তাঁর কর্মসূচী।

চ) দলের ভেতরকার উপদলীয় কলহ অভিভাবক হিসেবে মিটিয়ে না দিয়ে তিনি কোন একটি অংশের পক্ষ অবলম্বন করেছেন অথবা অনেক সময় নিস্ক্রিয় থেকেছেন। তাতে করে দল শক্তিশালী হতে পারেনি, তাঁর প্রতিপক্ষরা দলের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছেন। এছাড়া অনেক সময় তিনি ব্যবহৃত হয়েছেন অসাধু ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের দ্বারা। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী কালে কিছুদিন তিনি কট্টর দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল একশ্রেনীর রাজনীতিকদের তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগ দেন। যা ছিল তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের গৌরবময় ঐতিহ্যের পরিপন্থী ।

Dhaka University Institutional Repository

"বৃটিশ সাম্রজ্যবাদ, মার্কিন নয়া - সাম্রজ্যবাদী নীতি ও অন্যান্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উপনিবেশবাদী শক্তির তিনি ছিলেন অবিচল। তাদের কোনরকমের সাহায্য সহযোগিতার নীতির প্রতি ছিলনা তাঁর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস, তাদের তিনি ঘৃনা করতেন।"[১]

"মওলানা ভাসানী কমিউনিষ্ট ছিলেন না, কিন্তু কমিউনিষ্টদের সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিলেন। কমিউনিষ্টরা তাঁর উপর নির্ভর করতে পারত। মওলানা ভাসানী মনে প্রাণে সমাজতন্ত্রী ছিলেন। বিশ্বাস করতেন শ্রেণী সংগ্রামে । সবচেয়ে বড়কথা তিনি ছিলেন বিপ্লবী।"[২]

"ভাসানী ছিলেন তাঁর সময়ের একজন রষ্ট্রদেবতা । ১৯৩৭ এর পর থেকে সকল সরকার প্রধানেরই তাঁকে প্রয়োজন পড়েছে। সকল সরকারকেই তিনি তাদের গণবিরোধী কাজের জন্য সমালোচনা করেছেন। আবার তাঁদের পরামর্শও দিয়েছেন। অনেককে ক্ষমতায় বসতে সহায়তা করেছেন। অনেককে ক্ষমতাচ্যুত করেছেন তিনি। তিনি ছিলেন এ দেশের কৃষক ও শাসকের নেতা। বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতাদের নেতা তো বটেই। স্যার সাদউল্লাহ থেকে সোহরাওয়ার্দী, ফজলুল হক, আবু হোসেন সরকার, আতাউর রহমান খাঁন থেকে আইউব খাঁন, শেখ মুজিবর রহমান থেকে জিয়াউর রহমান - সকল সরকার প্রধানেরই প্রয়োজন হয়েছে তাঁর পরামর্শের; তিনি তাদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছেন কখনো কখনো। যদিও তাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন নীতি ও কর্মের নীতি তিনি কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। তাঁর স্নেহভাজন মুজিবের কথা স্বতন্ত্র। দুর দেশের মানুষ গর্ভনর এডমিরাল এস,এম আহসান পর্যন্ত সন্তোষে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মধ্যাহৃভোজ করেছেন।

(১) সৈয়দ আবুল মকসুদ- মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, বাংলা একাডেমী, মে ১৯৯৪ পৃষ্ঠা ২৬৮
(২) মওলানা ভাসানী, ব্যতিক্রমী ধর্মীয় নেতা ভাসানী, মজলুম জননেতার ষোড়শ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা, চট্টগ্রাম পৃষ্ঠা ২৪

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া ছোট বড় রাজনৈতিক নেতা, আন্ডার গ্রাউন্ড বিপ্লবী, বিদেশী কুটনীতি, উকিল, ব্যরিষ্টার, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সেনাবাহিনীর অফিসার প্রভৃতি বিচিত্র শ্রেণীর মানুষের অবাধ যাতায়াত ছিল মওলানার সন্তোষ ও পাঁচবিবির বাড়ীতে।"[১]

অনিবার্য কারনে তাঁর অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। তিনি নিরন্তর কাজ করেছেন এবং বিচিত্র বিষয়ে যে মানুষ জীবনে এত কাজ করেছেন তাঁর ভুল হবেনা তা ভাবা যায়না। এবং তাঁর একটি কাজ থেকে আর একটি কাজের মধ্যে দূরত্ব বা ফাঁক লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু সেই ফাঁক পুরণ করার জন্য আরো অনেক নেতা ও কর্মীর প্রয়োজন ছিল। তেমন কর্মী তিনি খুঁজে পান নি -এ তাঁর দুর্ভাগ্য জাতির ও। তবু তাঁর মত একজন নেতা এই ভূ-খন্ডে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাও জাতির জন্য কম সৌভাগ্যের ব্যাপারে নয়।

(১) সৈয়দ আবুল মকসুদ- মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, বাংলা একাডেমী, মে ১৯৯৪ পৃষ্ঠা ৬৩৪

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে মজলুম জননেতা ভাসানীর জীবনপুঞ্জীঃ-

১৮৮০সিরাজগঞ্জ মহকুমায় (এখন জেলা) ধানগড়া গ্রামে এক সাধারণ মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে মওলানা আবদুল হামিদ খাঁন ভাসানীর জন্ম। শৈশব নাম চেকা মিয়া। বাবা হাজী শরাফত আলী । সঠিক জন্ম তারিখ নিয়ে সংশয় অনেকের। ধরা হয় ১২ ডিসেম্বর তাঁর জন্মদিন।

১৮৮৬বাবা হাজী শরাফত আলীর পরলোক গমন।

১৮৯১মায়ের ইন্তেকাল। মৃত্যু ছিনিয়ে নিল বড় দুই ভাই এবং একমাত্র বোনটিকে। বিশাল বিশ্বে সহায় সম্বলহীন একলা মানব শিশু। বেদনা ঘন জীবনে শিশু চেকা মিয়ার নতুন উপলব্ধি। সংসার তাঁকে ঠেলে দিল পৃথিবীর পাঠশালায়।

১৮৯৭ শৈশবেই নিভৃত সবুজ থেকে তাকে পাঠানো হয়েছিল ময়মনসিংহের কল্লা গ্রামে বিদ্যার্থে। এখানেই পীর নাসির উদ্দিন বাগদাদীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়। পীরের হাত ধরে বাবা মা ভাই বোন হারা এতিম আব্দুল হামিদের আসামে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে যাত্রা। জীবনে আর কোন দিন ধানগড়া ফিরে আসেন নি । শেষ হলো এক পর্ব। শুরু হল নতুন অধ্যায়। সীমিত নিত্যতার বাইরে মুক্ত আকাশের নীচে মহামানুষের দিকে সেই শুরু তাঁর বিরাম বিহীন সংগ্রাম সংকুল রক্ত গন্ধ যাত্রার।

১৯০০গোয়ালপাড়া জেলার তিন ভুবিতে খুললেন স্কুল। এর আগে শিক্ষকতা করেছেন টাঙ্গাইলের কাগমারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। আরো ক'টি স্কুল ও মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা।

১৯০৩যে আগুন শৈশব থেকে ভিতরে জ্বলছিল তার প্রকাশ ঘটতে থাকে ক্রমে ক্রমে। শ্রমজীবি মানুষের পক্ষে যুবক জীবনের তাড়া অনুভব সংগঠন গড়ার। সর্বাত্মক শোষনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা চোখে মুখে নিয়ে সন্ত্রাসবাদী দলে যোগদান।

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৪ সন্ত্রাসবাদীদের সীমাবদ্ধতা যুবক আবদুল হামিদকে অচিরেই উপলব্ধি করালো যে, সাধারণ মানুষকে মুক্ত করার পথ এটা নয়। এবং যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ হরণ করেছে দেশের স্বাধীনতা তাঁর সাথে লড়তে হলে অবশ্যই সংগঠিত জনসমষ্টির সচেতন সাহচর্য প্রয়োজন। তিনি সন্ত্রাসবাদীদের দল পরিত্যাগ করলেন।

১৯০৭-৯ দেওবন্দে অবস্থান।

১৯১৮ প্রথম হজ্ব সমাপন।

১৯১৯ বৃহত্তর রাজনীতিতে তার পুরোপুরি অংশ গ্রহন। স্বদেশী ও অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ তখন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। কংগ্রেস ও খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করলেন। মওলানা মুহাম্মদ আলী, করমচাঁদ গান্ধী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মওলানা আজাদ সোবহানী, ওবায়াদুল্লাহ সিন্ধী, গোখলে প্রভৃতি সর্ব ভারতীয় নেতৃবর্গের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ। এই সময়ে তার ভাবনা, সাধারণ মানুষের ভাগ্যের উন্নতি ঘটাতে হলে, অবশ্যই বিতারিত করতে হবে বিদেশী শাসক শক্তি। এই সময়ে জীবনে প্রথম কারাবরণ ১৭ মাস।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি জমিদারী মহাজনী শোষনের স্বরুপ সম্পর্কেও মানুষকে সচেতন করার প্রক্রিয়ায় শুরু। বাংলাদেশ সব কুপ্রথা বিরোধী আন্দোলন তাঁকে নেতার মর্যাদা দেয়। কিন্তু জমিদারা এককাট্টা হয়ে সরকারী প্রশাসনের সহায়তায় আবদুল হামিদ খানের জন্য বাংলাদেশ নিষিদ্ধ ঘোষনা করেন।

১৯২৪ দেশজুড়ে সংঘটিত অবিচার অনাচারে ক্রুদ্ধ হন হামিদ খাঁন। লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা বাঙালী জমিদার মহাজনদের চক্রান্তে নিপাতিত হয় মানবেতর জীবনে। তাদের চক্রান্তে অসমীয়া বাঙালী দ্বন্দ্বের সৃষ্টি। প্রবর্তিত হয় ‘লাইন প্রথা’।

নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত এক গ্রন্থ রচনা। ‘লাঙ্গল যার জমি তার’ চেতনায় দীপ্ত হয়ে লাঞ্ছিত বিতাড়িত অসহায় মানুষদের ডাক দিলেন নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের। শুরু হল জমিদারের কাছ থেকে প্রজাবর্গের অধিকার আদায়ের নতুন পর্যায়। বরিত হলেন অবিসংবাদিত নেতা রুপে। আসামের গোয়ালপাড়া জেলার ধুবড়ী মহকুমার ব্রহ্মপুত্র নদের ভাসান চরে ঐতিহাসিক সম্মেলনের আয়োজন। ভাসানচর লক্ষ লক্ষ মানুষে প্লাবিত করেছিলেন বলেই হলেন ‘ভাসানী’। মওলানা ভাসানী।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৫ মওলানার প্রথম বিয়ে। কনে বগুড়া জেলার বীর নগরের জমিদার কন্যা আলেমা খাতুন। এর পর মওলানা সম্পূর্ন রাজনৈতিক কারণে আরও দুইটি বিয়ে করেন। একটি রাজশাহীর রানী নগরে। সে স্ত্রীদের সাথে মওলানার ঘরকন্নার তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না । তাঁরা মওলানার জীবিত কালেই মৃত্যু বরণ করেন। রানী নগরের হামিদা খানমের গর্ভে মওলানার তিন সন্তান জন্ম হয়। এই স্ত্রী আমৃত্যু রংপুরের ভুরুঙ্গামারীর বাসিন্দা ছিলেন।

১৯২৬ আসামে প্রথম কৃষক প্রজা আন্দোলনের সূত্রাপাত ঘটান। সর্ব প্রথম কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি শাসক সম্প্রদায়ের ভিত কাঁপিয়ে দেয়।

১৯২৮ আসামের কাগমারীতে জঙ্গল পরিষ্কার করে কুঁড়েঘর তৈরী এবং সেখানেই স্থায়ী আবাস গড়েন । এ কাজে শরিক করেন আসামে প্রবাসী বাঙালীদের। বাস্তুত্যাগী বাঙ্গালীদের উদ্বুদ্ধ করেন নতুন বসতি গড়তে। এখানে তিনি স্কুল, কলেজ, দাতব্য চিকিৎসালয়, উইভিং কলেজ, মাদ্রাসা পশু হাসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। এ স্থানটি এখন 'হামিদাবাদ' নামে খ্যাত হয়ে উঠেছে।

১৯২৯ আসামের ভাসান চরে পুনরায় ঐতিহাসিক সম্মেলনের আয়োজন।

১৯৩০ কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান ।

১৯৩১ জীবনে প্রথমবারের মতো সন্তোষ কাগমারীতে বন্যার রিলিফ নিয়ে আগমন। সন্তোষের অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে ব্যাপক কর্মকান্ডের মাধ্যমে কৃষকদের জঙ্গী সংগঠন গড়ে তোলেন। তিনি জানতে পারেন সন্তোষের জমিদারী মূলতঃ পীর শাহ জামানের। তিনি জমিদারী মালিকানার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে বসেন। জমিদার বিরোধী আন্দোলনের সংগঠক মওলানাকে মহারাজার পক্ষে সরকারী কর্তৃপক্ষ বৃহত্তর ময়মনসিংহ থেকে বহিস্কার করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩২ বহিস্কৃত হয়ে মওলানার নিজ জেলা পাবনায় আগমন। সিরাজগঞ্জের কাওয়া খোলায় ঐতিহাসিক কৃষক সম্মেলনঅ এই সম্মেলন 'বঙ্গ আসাম প্রজা সম্মেলন' নামে খ্যাত। এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন অবসর প্রাপ্ত সিভিল সার্ভেন্ট খাঁন বাহাদুর আবদুল মোমিন। সম্মেলনে জমিদারী অবসান, মহাজনদের নিয়ন্ত্রন করা প্রভৃতি দাবী সম্বলিত প্রস্তাব গ্রহন করা হয়েছিল। সম্মেলনের কারণে শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট হচ্ছে অযুহাত দেখিয়ে পাবনা থেকেও তাঁকে বহিস্কার করা হয়। রংপুর জেলার গাইবান্ধায় চলে যান অতঃপর। সেখানেও আয়োজন করেন বিশাল এক জঙ্গি কৃষক সমাবেশের।

১৯৩৪ বন্যার্ত্তদের সাহায্যের জন্য রাজশাহীর নওগাঁয় আয়োজন করেন আরও একটি কৃষক সমাবেশের। ফল স্বরুপ বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানকে চিরতরে বহিস্কার করা হলো বাংলাদেশ থেকে।

১৯৩৫ আসামে 'বাঙাল খেদাও' আন্দোলনের সূত্রপাত হলে মওলানা সিংহবিক্রমে এর বিরুদ্ধে দৃঢ় ও বৈপ্লবিক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন, পরিণামে কারবরণ।

১৯৩৭ আসামে মওলানার বিখ্যাত ' লাইন প্রথা' বিরোধী আন্দোলনের সূচনা। আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি হিসাবে মুসলিম লীগেরই মূখ্যমন্ত্রী স্যার সাদুল্লাহ্‌র সাথে এ নিয়ে প্রচন্ড মত বিরোধ। আন্দোলন সাদুল্লাহ সরকারের বিপক্ষে যায়। এই মতভেদ থেকে আয়োজন করেন ঐতিহাসিক বরপেটা সম্মেলনের। সম্মেলনের সভাপতি হন চৌধুরী খালেকুজ্জামান। দুজনে মতপার্থক্য নিরসনে ভুমিকা রাখতে কেন্দ্র থেকে আসেন কাজী মুহাম্মদ ঈশা ও মামদোতের নবাব। মওলানার যুক্তির কাছে হার মানেন সাদুল্লাহ।

১৯৩৮-রংপুরের গাইবান্ধায় পুনরায় কৃষক সম্মেলনের আয়োজন।
বড়পেটায় কৃষক সম্মেলন। মঙ্গলদাই-কৃষক সম্মেলন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪০আল্লামা আজাদ সোবহানী সমভিব্যবহারে আলআজাহার বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন ও দ্বিতীয়বার হজ্ব সমাপন।

১৯৪৬আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি হিসাবে এ কে ফজলুল হকের সঙ্গে ঐতিহাসিক লাহোর সম্মেলনে অংশ গ্রহণ।

১৯৪৬ভারত বিভাগের পূর্বে অনুষ্ঠিত 'সিলেট গণভোট' এ তাঁর নেতৃত্ব দান। ঐতিহাসিক চারাবাড়ী সম্মেলন । অত্যাচারি জমিদারদের কাছ থেকে পীর শাহ জামানের দীঘি দখল।

১৯৪৭আসামে ৩ ও ৪ মার্চ বেঙ্গল আসাম মুজাহিদ ও সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন এবং আবার কারাবরণ। আটক অবস্থায় জন্ম হয় পাকিস্তানের।

১৯৪৮ ভারতীয় কারাগার থেকে মুক্তি লাভ। আসাম থেকে হলেন বহিস্কৃত। ফিরে এলেন আপন বাংলায়।আস্তানা গড়লেন তাঁর স্বপ্নের সন্তোষে। রাষ্টভাষা আন্দোলনের শুরু। সক্রিয় ভাবে যুক্ত হলেন এর সাথে। ৩ জুন জন্ম দিলেন পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগের। তিনি হলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। এ বৎসরই প্রকাশ করলেন 'সাপ্তাহিক ইত্তেফাক' পত্রিকা ।

১৯৪৯ মওলানার নেতৃত্বে ১১ অক্টোবর আরমানিটোলা ময়দানে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম জনসভা। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনয়ণ। পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী ঢাকায় এলে তিনি ভুখা মিছিল বের করেন। ১২ অক্টোবর পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে পাকিস্তানে প্রথম হরতাল আহবান। ১৪ অক্টোবর বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স বলে সরকার কর্তৃক কারকুন বাড়ী লেনস্থ ইয়াদ মুহম্মদ খানের বাসা থেকে গ্রেফতার ।

১৯৫০জেলে অনশন ধর্মঘট শুরু। এবং বন্দীদশা থেকে মুক্তিলাভ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫২ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় সহযোগিতার কারনে আবার কারাগারে আটক।

১৯৫৩মওলানার নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার আওয়ামী লীগ যুদ্ধ জোটের বিরোধীতা করার প্রস্তাব নেয়।

১৯৫৪ মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠন। মওলানার কর্মোদ্দ্যমের ফলে নির্বাচনে ঐতিহাসিক বিজয় লাভ। বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগদানের জন্য বার্লিন যাত্রা। ৫ মাস লন্ডনে অবস্থান। ষ্টকহোমে বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগদান। দেশে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ৯২ ক ধারা জারী । তৎকালীন গভর্ণর ইসকান্দার মীর্জা কর্তৃক মওলানা ভাসানীকে দেখা মাত্র গুলি করার নির্দেশ। ফলে স্বদেশে ফেরার পথে কলকাতায় অবস্থান। আদমজী শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত। এই ইউনিয়ন নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। যুক্তফ্রন্টের পতনের জন্য শাসকগোষ্ঠী আদমজীতে বাঙালী বিহারী দাঙ্গা বাধালেন।

১৯৫৫ ধর্ম নিরপেক্ষতার দাবীতে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বর্জন করলেন। এ নিয়ে অন্যান্য আওয়ামী নেতাদের সাথে তাঁর মতানৈক্য।

১৯৫৬ কৃষক সমিতি ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর পত্তন। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির দাবী তুললে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে ঘটলো মতান্তর। 'পাক মার্কিন' সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে গড়ে তুললেন মজবুত আন্দোলন। দাবী তুললেন সর্বাধিক স্বায়ত্বশাসনের। এ সময়ে প্রতিক্রিয়াশীল মহল ও সরকার তাঁকে ভারতের দালাল বলে চিহ্নিত করলেন।

১৯৫৭, ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারী ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন। আওয়ামী লীগের ভাঙ্গনের সূচনা ২৫ জুলাই পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি বিখ্যাত 'আসসালামু আলাইকুম' প্রদান। প্রগতিশীল শিবিরের পার্টি 'ন্যাপ' গঠন। রংপুরের ফুলছড়িতে কৃষক সম্মেলন।

১৯৫৮সারাদেশে সামরিক আইন জারী । আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল । মওলানা ও গ্রফতার। এবং চার বছর দশ মাস একটানা অন্তরীন জীবন যাপন।

১৯৬২বন্যা দুর্গতদের সাহায্যে দাবীতে আমরণ অনশন। 'দেশের সমস্যা ও সমাধান' গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৬৩মার্চে আইয়ুবের সাথে সাক্ষাৎ। প্রথম গণচীন সফর। চেয়ারম্যান মাও ও চৌ এন লাইয়ের সংগে গড়ে উঠলো আন্তরিক সম্পর্ক। 'মাও সে তুঙ্গের দেশে' নামক গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৬৪পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী শিবির গঠন। আইয়ুব বিরোধী 'প্রতিবাদ দিবস' - এ নেতৃত্ব দান। সার্বজনীন ভোটাধিকার সংগ্রাম পরিষদ গঠন। টোকিওতে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে যোগদান । পুনরায় চীন সফর। হাভানার বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগদান ।

১৯৬৫ প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহর নাম প্রস্তাব। পাক ভারত যুদ্ধে একতা সংহতি ও স্বাধীনতার প্রতি ব্যাপক জনমত গঠন।

১৯৬৭ ন্যাপে ভাঙ্গন। মওলানার বিখ্যাত ঘোষনা। 'গনতান্ত্রিক সংগ্রামে এক মাত্র সর্বহারা শ্রেণীই নেতৃত্ব দিতে সক্ষম, আর কোন শ্রেণী নয়।' রংপুরের ভুরুঙ্গামারী থানার দক্ষিন ছাট গোলাপ পুর গ্রামে দুদিন ব্যাপি বিরাট কৃষক সম্মেলন। আবদুর রউফ শিকদার নামের ৭/৮ বছরের এক কিশোরের কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে উদ্বোধন হয় মূল জনসভার।

১৯৬৮সমগ্র দেশব্যপী গণঅভ্যুত্থানের সূচনা করলেন মওলানা। ৫ অক্টোবর সন্তোষে ন্যাপের ১০ দফা দাবী প্রনয়ণ ও ৩ নভেম্বর দাবী দিবসের পালনের সিদ্ধান্ত। ৩

Dhaka University Institutional Repository

নভেম্বর পল্টনে জনসভা পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের স্বপক্ষে উত্তেজনাকর বক্তৃতা। ১ ডিসেম্বর, জুলুম প্রতিরোধ দিবসের অংশ হিসাবে পল্টনে বিরাট জনসভা। সভাশেষে মিছিল করে গর্ভণরের বাসভবন ঘেরাও। পরদিন হরতাল ঘোষণা। ৭ ডিসেম্বর হরতাল পালিত। নীলক্ষেত পুলিশের গুলিতে একজন নিহত। ২৯ শে ডিসেম্বর পাবনায় জনসভায় নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষনা। সভা শেষে পাবনার ডেপুটি হাই কমিশানরের বাসভবন ঘেড়াও-এর মাধ্যমে এ দেশীয় তথা বিশ্ব রাজনীতিতে সর্ব প্রথম 'ঘেরাও আন্দলন' এর বীজ বপন করলেন। হরতাল সারা দেশব্যাপী।

১৯৬৯ কৃষক সমিতির সভাপতি হিসেবে ৮ জানুয়ারী থেকে ১৫ জানুয়ারী পর্যন্ত প্রতিটি গ্রামে হাতিরদিয়া ও নড়াইলের সরকারী গণহত্যার প্রতিবাদে জনসভা ও ঘেরাও এর আহবান জানিয়ে প্রচার পত্র প্রকাশ। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে 'জেলখানা ভেঙ্গে মুজিবকে ছিনিয়ে আনব' বলে সরকারের প্রতি হুমকি প্রদান । জনসভা শেষে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হকের গায়েবানা জানাজা পাঠ। ফলস্বরূপ শেখ মুজিবের মুক্তিলাভ। মওলানার সাথে তাঁর রুদ্ধদ্বার বৈঠক। গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী । সমাজতন্ত্রের স্বপক্ষে আধিপত্যবাদ সামাজ্যবাদ ও সেন্টো সিয়াটো চুক্তির বিরুদ্ধে জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে চুক্তি সম্পাদন। ন্যাপের ডাকে পশ্চিম পাকিস্তান গমন। বিভিন্ন জনসভায় ব্যাপক সমাবেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগুন ঝরা শপথ গ্রহন। এই সফরে জামায়াতে ইসলামীর গুন্ডারা শাহিওয়ালে মওলানার উপর হামলা চালায়। এপ্রিল মাসে টাইম ম্যাগাজিন কর্তৃক 'প্রফেট অব ভায়োলেন্স' আখ্যা লাভ। ঢাকায় ফিরলে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণঢালা সংবর্ধনা জ্ঞাপন। মহিপুর কৃষক সম্মেলন। বাঙালী বিহারী দাঙ্গা বিরোধী মিছিল। 'ভোটের আগে ভাত চাই' বই প্রকাশ।

১৯৭০ সন্তোষের জাতীয় সম্মেলনে কৃষক রাজ শ্রমিক রাজ প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহন। পূর্ব পাকিস্তানের মর্যাদা অর্জনের ৬ দফা দাবী প্রণয়ন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দরবার হল প্রতিষ্ঠা।

Dhaka University Institutional Repository

১০ জানুয়ারী পল্টনে বিশাল জনসভা।

১৯ জানুয়ারী সন্তোষের কৃষক সম্মেলনে নতুন এক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঘোষনা।

২৩ মার্চ টোবাটেক সিং -এ কৃষক সম্মেলন। রেসকোর্সে পঞ্চম সমাবেশ। প্রবল বর্ষণেও ২৮ দফার চরমপত্র গভর্ণর আহসানকে দেয়ার জন্য মিছিল নিয়ে গমন। ১১ অক্টোবর শেষবারের মতো পশ্চিম পাকিস্তানে গমন। ১৩ দিনে ১২টি জনসভায় সংগ্রামের ডাক। অসুস্থ শরীর নিয়ে ৭০-এর প্রলয়ংকরী জলোচ্ছাস পীড়িত এলাকা পরিদর্শন। ফিরে এসে পল্টনের জনসভায় দুর্গত মানবতার করুন বর্ণনা প্রদান। পাকিস্তানী শাসক ও শোষক সম্প্রদায়ের প্রতি অঙ্গুলি উঁচিয়ে বললেন, 'ওরা কেউ আসেনি'। এ সভাতেই পাকিস্তানের সাথে সব সম্পর্ক চুকিয়ে স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার দাবী উত্থাপন করলেন।

১৯৭১ পূর্ব পাকিস্তানের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় সম্মেলন আহবান। ইসলামী বিশ্ববিদ্যাল শিক্ষা সম্মেলন। পল্টনে জনসভায় ভাষণ।

২১ মার্চ চট্টগ্রামে লালদিঘীর জনসভায় স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরুর ডাক।

২৫ মার্চের পর আত্মগোপন ও ভারত গমন। ভারতে থাকাকালিন পুরো সময় তাঁকে দিল্লীতে অন্তরীন করে রাখা হয়।

১৯৭২ ভারতের বন্দীদশা থেকে মুক্তিলাভ। ২২ জানুয়ারী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। 'সাপ্তাহিক হক কথা' প্রকাশ করলেন। বাম ঐক্যের আহবান। জাতীয় সরকার গঠনের পরামর্শ দিলেন শেখ মুজিব কে।

৯ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর প্রথমবারের মতো আগমন চিকিৎসার্থে।

১০ ফেব্রুয়ারী পিজিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে দেখতে যান।

Dhaka University Institutional Repository

২৬ ফেব্রুয়ারী সন্তোষের কৃষক সমাবেশে সরকারের প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ । ৯ এপ্রিল পল্টনে লক্ষাধিক লোকের সভায় রাজনৈতিক অরাজকতা সম্পর্কে প্রথম প্রকাশ্য হুঁশিয়ারী। নির্বিচারে রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের বিরোধীতা করে বললেন, 'মুজিব নকশাল কারো গায়ে লেখা থাকে না' ব্যাপক চোরা চালানের বিষ ফল সম্পর্কেও সাবধান করলেন সকলকে।

শিবপুরে দুদিনের কৃষক সম্মেলন । খসড়া শাসনতন্ত্রকে অস্বীকার। 'সমাজ তন্ত্র দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক শ্রমিকের মুক্তির একমাত্র পথ। শোষক শ্রেণীকে নির্মূল করে 'সমাজ তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা না গেলে বাংলাদেশের কৃষকের মুক্তি আসবে না'- ঘোষনা। চোরা চালান, মজুতদারী, কালোবাজারী, ঘুষ, দুর্নীতি, হাইজ্যাক, হত্যাকান্ড প্রতিরোধ করার জন্য সন্তোষে জোয়ান কর্মী সম্মেলন।

১৯৭৩খাদ্যের দাবীতে আমরণ অনশন শুরু। 'প্রাচ্যবার্তা' পত্রিকা প্রকাশে পৃষ্ঠ পোষকতা প্রদান । ২য় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্মেলন। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মো) ও বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির ত্রিদলীয় সভায় মনি সিং ভারত রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রচারনা চালানোর অভিযোগ মওলানা ভাসানীকে কেটে টুকরো টুকরো করে বাংলার মাটি থেকে চিরতরে উৎখাতের হুমকি দিলেন।

জবাবে মওলানা বলেন 'শ্রী মনি শিং চাহিতেছেন দেশে বড় একটা গোলযোগ বাঁধাইয়া উহার উসিলায় এখানে রুশ ও হিন্দের প্রভাব আরো প্রত্যক্ষ ও মজবুত করিতে। আমি দ্বর্থহীন কণ্ঠে ঘোষনা করিতেছি এক বিন্দু রক্ত থাকিতে বাংলাদেশে ভারত ও রাশিয়ার কোন প্রকার ষড়যন্ত্র কায়েম হইতে দিব না।'

'১৯৭৪ দুর্ভিক্ষ, দুর্নীতি ও সকল প্রকার অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে হুকুমাতে রব্বানিয়া সমিতি গঠন'। ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক। খাদ্যের দাবীতে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠন ও নেতৃত্ব দান। আমরণ অনশন। মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু ও ১৪৪ ধারা ভঙ্গ। এজন্য স্বাধীন বাংলাদেশে শেখ মুজিব সরকার তাকে সন্তোষে অন্তরীন করে রাখলেন । ভারত রাশিয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী প্রদান।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৫ স্বাধীনতা শত্রুদের সম্পর্কে জনগনকে সতর্ক থাকার আহবান।
সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নির্মান কাজে আত্ম নিয়োগ। ধর্মীয় সমাবেশের আয়োজন। চাষী সম্মেলন। নিম্নতম কর্মসুচীর ভিত্তিতে হলেও স্বাধীনতার সপক্ষে দলমত নির্বিশেষে সকলের ঐক্য কামনা ।

১৯৭৬ সীমান্তে ভারতীয় উসকানী ও হামলার বিরুদ্ধে জনমত দৃঢ় ও সংহত করার জন্য ব্যাপক সীমান্ত সফর। অসুস্থ অবস্থায় পিজি হাসপাতালে ভর্তি। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় জাতীয় ঐক্যের দুর্ভেদ্য দূর্গ গড়ে তোলার ডাক, হাসপাতালের বেড থেকে।আবুজর গিফারী কলেজ প্রঙ্গনে হযরত আবু জর গিফারীর মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে স্বাধীনতা রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ ত্যাগ স্বীকারের আহবান।

ফারাক্কায় ভারত কর্তৃক একতরফা পানি প্রত্যাহারকে বিশ্ব ইতিহাসে এক নজীর বিহীন অমানবিকতা বলে উল্লেখ। ১৭ এপ্রিল ইন্দিরা গান্ধীর কাছে প্রেরিত খোলা চিঠি প্রকাশ করলেন। ঘোষনা করলেন একই সঙ্গে, ফারাক্কা বাঁধ ভেঙ্গে দাও। নইলে ১৬ মে রাজশাহী থেকে লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষ মানুষ সহ লং মার্চের আয়োজন করবো।
২৮ এপ্রিল ফারাক্কা মিছিল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা। ১৬ মের মিছিলে অংশ নেবার জন্য দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রতি উদাও আহবান। ১১ মে ফারাক্কা মিছিলের জন্য রাজশাহী উপস্থিতি।
১৬ মে রাজশাহী মাদ্রাসা ময়দান থেকে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে উজ্জ্বল মিছিলটির ৪৮ মাইল পথে যাত্রা হল শুরু। ভাষণে বললেন, সুবিচার অর্জনের লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।
ঐ দিন সন্ধ্যায় নবাবগঞ্জে ঘোষনা করলেন, 'ভারত ফারাক্কা সমাধানে রাজি না হলে ভারতীয় পণ্য বর্জনে ডাক দিব "ফারাক্কার" প্রতিক্রিয়া স্বচক্ষে দেখাবার জন্য ইন্দিরা গান্ধীকে আনমন্ত্রন জানালেন।
১৭ মে সীমান্তবর্তী কানসার্টে মিছিলের সমাপ্তি ঘোষনা করে বললেন, 'নিরস্ত্র মানুষের ভয়ে ভারতকে যখন সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করতে হয়েছে তখন তাঁর উচিৎ অবিলম্বে ফারাক্কা সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসা।

Dhaka University Institutional Repository

'২৭ মে সন্তোষে সাংবাদিক সম্মেলন । ৭১ এর পর কত গুপ্ত হত্যা, ব্যাংক ও ধনসম্পদ লুট হয়েছে তা নির্ণয়ের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে'- বললেন।

২৭ মে পুনরায় পিজি হাসপাতালে ভর্তি।

৫ জুন পিজি থেকে বিবৃতি প্রদান।

৩১ জুলাই নির্বাচনের আগে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন।

১৩ আগষ্ট চিকিৎসার্থে লন্ডন যাত্রা।

১২ সেপ্টেম্বর ২৯ দিন পর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

২ অক্টোবর 'খোদাই খিদমতগার' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের নাম ঘোষনা।

৭ নভেম্বর অসুস্থ মওলানার ঢাকা মেডিকেল কলেজে সাংবাদিক সম্মেলন।

১৩ নভেম্বর সন্তোষে মওলানার সভাপতিত্বে 'খোদাই খিদমতগার' এর প্রথম সম্মেলন সুরু।

১৪ নভেম্বর ব্রংকাইটিসে আক্রান্ত মওলানার পুনরায় ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি। পূর্ন বিশ্রামের জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ দান।

১৭ নভেম্বর শতাব্দীর শেষ মহাপুরুষ মজলুম জননেতা মওলান ভাসানীর ইন্তেকাল দীর্ঘ সংগ্রাম মুখর জীবনের মহা সমাপ্তি । ৭দিন ব্যাপী জাতীয় শোক ঘোষনা ।

১৮ নভেম্বর লক্ষ লক্ষ মানুষের আকুল কান্না আর লাষ্ট পোষ্টের করুন মূর্ছনার ভিতর দিয়ে মজলুম জনতার প্রাণপ্রিয় নেতাকে অন্তিম শয্যায় শুইয়ে দেয়া হলো; তার স্বপ্নের সন্তোষে, সাধের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১। অলিআহাদ- *জাতীয় রাজনীতি*- বইটিতে প্রকাশনা সংস্থার নাম ও সন দেওয়া নেই।

২। আতিউর রহমান-*ভাষা আন্দোলন, পরিপ্রেক্ষিত বিচার*- ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ ১৯৯০।

৩। আতিউর রহমান খাঁন- *ওজারতির দুই বছর*- ঢাকা নওরোজ কিতাবিস্তান, ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩।

৪। আরেফিন বাদল-*মওলানা ভাসানী*- নাটোর প্রেস, ১৯৭৭।

৫। আবুল মনসুর আহমদ- *শেরেবাংলা হইতে-বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৮১।

৬। আবুল মনসুর আহমদ- *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*- ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্থান, আগষ্ট ১৯৭৫।

৭। আবু আলসাঈদ- *দেশ বন্ধু থেকে বঙ্গবন্ধু* ঢাকা আগামী প্রকাশনী, জানুয়ারী ১৯৬৯।

৮। আব্দুল মতিন ও আহম্মদ রফিক- ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও তাৎপর্য- ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২।

৯। আসাদুজ্জামান - *স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি*- ঢাকা, আগামী প্রকাশনী,১৯৯৪।

১০। এম,আর, আকতার মকুল- *চল্লিশ থেকে একাত্তর*- ঢাকা, সাগর পাবলিশার্স, মে, ১৯৮৫।

১১। এম,আর, আকতার মকুল- *আমি বিজয় দেখেছি*- ঢাকা, সাগর পাবলিশার্স, ডিসেম্বর, ১৯৮৮।

১২। এম,আর, আকতার মকুল- *পাকিস্তানের চব্বিশ বছর*- ঢাকা, সাগর পাবলিশার্স, অক্টোবর, ১৯৮৯।

১৩। কাদের সিদ্দিকী- *ভাসানীকে যেমন জেনেছি*- ঢাকা, পল্লব পাবলিশার্স ডিসেম্বর, ১৯৮৮।

১৪। খন্দকার মোঃ ইলিয়াস -*ভাসানী যখন ইউরোপে*- ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৮৭।

১৫। খন্দকার আব্দুর রহিম- *শতাব্দীর জননেতা মওলানা ভাসানী*- টাঙ্গাইল খন্দকার প্রকাশনী, মার্চ, ১৯৯৩।

১৬। তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)- *পাকিস্তান রাজনীতির বিশ বছর*- ঢাকা, বাংলাদেশ বুক ইন্টারন্যাশনাল, ১৯৮১।

১৭। আব্দুল মতিন- *আমার দৃষ্টিতে মওলানা ভাসানী* , ঢাকা, ফাহাত প্রকাশনী, জুন ১৯৮৪।

১৮। তোফায়েল আহমেদ- *ঊনসত্তরের গণআন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু*- ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

১৯। দেওয়ান গোলাম মোস্তফা- *ভাসানীর জীবনের অলিখিত অধ্যায়*- হবিগঞ্জ, ফারজানা প্রকাশনী ১৯৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

২০। প্রফেসর সালাউদ্দিন আহমেদ, মোনায়েম সরকার ও ডঃ নুরুল ইসলাম মঞ্জুর- *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস* (১৯৪৭-১৯৭১)- বাংলা বাজার, আগামী প্রকাশনী ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭।

২১। বদরউদ্দিন উমর- *পূর্ব বাংলা ভাষা আন্দোলন ও তৎকালনি রাজনীতি*- ঢাকা ইভেন প্রকাশনী, নভেম্বর, ১৯৭০।

২২। বদরউদ্দিন উমর- *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গঃ কতিপয় দলিল*- ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর ১৯৮৪।

২৩। বদরউদ্দিন উমর- *যুদ্ধ পূর্ব বাংলাদেশ*- ঢাকা, মুক্তধারা মার্চ, ১৯৮৭।

২৪। বিপুল রঞ্জন- *বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক দলিল*- ঢাকা, বুক সোসাইটি, বাংলাবাজার, ১৯৮২ ।

২৫। বশীর আল হেলাল- *ভাষা আন্দোলন ইতিহাস*- ইতিহাস ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

২৬। মওদুদ আহমদ - *বাংলাদেশ স্বায়ত্বশাসন থেকে স্বাধীনতা*- ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ ১৯৯২।

২৭। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী- *মাও-সে-তুঙ্গ এর দেশে*- পুঁথিপত্রের পক্ষে প্রকাশ করেছেন, নুরজাহান সুলতান।

২৮। শাহরিয়ার কবির-*মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম*- ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্থান, মে ১৯৮৭।

২৯। শাহজাহান মন্টু, রবিউল করিম দুলাল- *মওলানা ভাসানী*- ঢাকা, চলন্তিকা, কম্পিউটার, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫।

৩০। সাইফুল ইসলাম- *স্বাধীনতা ভাসানী ভারত*- ঢাকা, অয়ন প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭।

৩১। সৈয়দ আবুল মকসুদ- *মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর জীবন, কর্মকান্ড, রাজনীতি ও দর্শন*- ঢাকা, দি ষ্টার প্রেস, জানুয়ারী, ১৯৮৬।

৩২। সৈয়দ আবুল মকসুদ- *মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, মে, ১৯৯৪।

৩৩। সৈয়দ ইরফানুল বারী- *মওলানা ভাসানীর ভূমিকা*- সন্তোষ, ১৯৭৪।

৩৪। সৈয়দ ইরফানুল বারী- *আমার ভালবাসায় মওলানা ভাসানী*- সন্তোষ, ১৯৯২।

৩৫। হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায়- *একুশে ফেব্রুয়ারী*- ঢাকা, পুথিপত্র প্রকাশনী, মার্চ, ১৯৫৩।

৩৬। হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় তথ্য মন্ত্রনালয়ের পক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার- *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্রঃ, ১ম খন্ড*, ঢকা, নভেম্বর ১৯৮২।

৩৭। সৈয়দ আবুল মকসুদ *ভাসানী* প্রথম খন্ড, ঢাকা, নওরোজ সাহিত্ব সংসদ, জানুয়ারী ১৯৮৬।

৩৮। সৈয়দ মকসুদ আলী *রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তায় উপমহাদেশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

৩৯। মওলানা ভাসানী স্মারক সংকলন সম্পাদনা মহসিন শস্ত্রপাণি, *মজলুম জননেতা* মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী পরিষদ প্রকাশন, ডিসেম্বর ২০০২।

৪০। আব্দুল হাই শিকদার *কিশোর মওলানা ভাসানী,* ঢাকা জ্ঞান বিতরণী, একুশে বই মেলা ২০০১।

৪১। আব্দুল হাই শিকদার ইতিহাসের ব্যাতিক্রম: ব্যাতিক্রমের ইতিহাস *জানা অজানা মওলানা ভাসানী,* শিরিন পাবলিকেশন্স, ঢাকা মার্চ ২০০১।

৪২। ম. ইনামুল হক, *আব্দুল হামিদ খান ভাসানী* সংক্ষিপ্ত জীবনী, সমাজ রূপান্তর অধ্যয়ন কেন্দ্র অক্টোবর ২০০৫।

৪৩। নজরুল ইসলাম, *আসাম ও মওলানা ভাসানী এবং লাইন প্রথা- বাঙালখেদা* বর্তমান সময় প্রকাশনী ঢাকা, জুন ২০০৩।

৪৪। অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ, *কিছু কথা* নিজাম উদ্দিন আহমেদ প্রকাশক, ডিসেম্বর ১৯৯১।

৪৫। হায়দার আকবর খান রনো, *শতাব্দী পেরিয়ে* তরফদার প্রকাশনী ফেব্রুয়ারী ২০০৫।

৪৬। রাশেদ খান মেনন, *রাজনীতির কথকতা* নৃদুল প্রকাশক, ফেব্রুয়ারী ২০০০।

৪৭। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশে রাজনীতিতে ধর্ম ও ধর্ম নিরপেক্ষতা* প্রেরনা প্রকাশনী ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩।

1. Azizur Rahman Malliak – *The British Policy and the Muslims of Bengal (1757-1858)*- Dhaka Bangla Academy, 1961.
2. Badruddin Umar- *Politics and Society in East Pakistan and Bangladesh*- Dhaka, Modern Type Founders, Printers and Publishers Ltd. February 1974.
3. G.W. Chowdhury- *Documents and Speches on the Constitution of Pakistan*- Dhaka, Green Book House, 1967.
4. Jyotisen Gupta- *History of Freedom Movement in Bangladesh*- Calcutta, Naya Prokash January 1974.

Dhaka University Institutional Repository

5. Keith Callard- *Pakistan: A Political Study*- London, George Allen and Unwin Ltd.
6. Moudud Ahmed- *Bangladesh: Constitutional Quest for Autonomy 1950-1971*- Dhaka, University Press Ltd. 1979.
7. Muzaffar Ahmed Choudhury- *Government and Politics in Pakistan*- Dhaka, Puthigar Ltd.
8. Mohammad Ayub Khan – *Friends not Masters*- Oxford University Press, 1967.
9. Moudud Ahmed-*Era of Sheikh Mujibur Rahaman*- Dhaka University Press Ltd. December 1983.
10. Dr. Mustafa Chowdhury – *Pakistan politics and Bureaucracy*- New delhi, associated publishing House, 1988.
11. Muhammad Abdur Rahim- *The Muslin Society and politics in Bengal (1757-1947)*- Dhaka The University of Dacca, 1978.

প্রবন্ধ নিবন্ধ

১। আবু জাফর সামসুদ্দিন- *কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন*-দৈনিক সংবাদ স্মৃতিচারন,৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৮২।

২। আবদুল মতিন - *"মওলানা ভাসানীকে জানা এ দেশের সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ বিরোধী জনগন ও রাজনীতির জন্য একান্ত প্রয়োজন"* - ভাসানী (ত্রৈমাসিক) প্রথম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৯৩।

৩। ডাঃ ক্যাপ্টেন আব্দুল বাছেত - *মওলানা ভাসানীর দর্শন* - সাপ্তাহিক অগ্রপথিক মওলানা ভাসানীর স্মরন সংখ্যা, ১৯৯০।

৪। ডাঃ কামাল উদ্দিন আহমদ - *"সংসদীয় রাজনীতিতে মওলানা ভাসানী"* - দৈনিক বাংলা, ১৭ নভেম্বর ১৯৯৩।

৫। ডাঃ নুরুল ইসলাম - *"ভাসানীকে যেমন দেখেছি"*- অন্তিম শয্যায় মওলানা ভাসানীর সংগে সাক্ষাৎকার বিচিত্রা, ১৮ জানুয়ারী ১৯৮০।

Dhaka University Institutional Repository

৬। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ - *"পূর্ণাঙ্গ মানবতাবাদের প্রতিনিধি মওলানা ভাসানী"* 'সাপ্তাহিক অগ্রপথিক' মওলানা ভাসানীর স্মরন সংখ্যা, ১৯৯০।

৭। ফরহাদ মজহার - " *মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং তাঁর ইসলাম"* - খবরের কাগজ, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯১।

৮। সামসুজ্জামান খান - *"স্মৃতিতে মওলানা ভাসানী"* - বাংলাবাজার পত্রিকা, ২২ পৌষ ১৩৯৯ বাংলা।

৯। সিরাজুল ইসলাম-*"মওলানা ভাসানীর ভূমিকা"* নেতা জনতা ও রাজনীতি,ডানা প্রকাশনী,ঢাকা, ১৯৮৭

১০। সরদার জয়েনউদ্দিন-" *মনে পড়ে মওলানা ভাসানী"*- দৈনিক সংবাদ, ১৬ শ্রাবন, ১৩৯২।

১১। হায়দার আকবর খান রনো- *"ব্যতিক্রমধর্মী নেতা ভাসানী"*- গণতান্ত্রিক ফোরাম, চট্টগ্রাম, ১৯৯২।

১২। *মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর স্মরনে*। মহাবিদ্রোহী মহানায়ক মুর্শিদ মওলানার ১৯তম ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত প্রকাশনায় সন্তোষ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং মওলানা ভাসানী মাজার কমিটি। সম্পাদক- ইরফানুল বারী, ১৯৯৫।

13. Enayetullah Khan: Bhasani-The Dream and the substance, The Weekly Holiday Dhaka, January 18, 1970.

14. K.A. Kamal Bar-at-Law-Moulana Bhasani: A Political Biography, The weekly Holiday, January 18, 1970.

15. Syed Abdul Maksud: A Tribute to Maulana Bhasani, The Bangladesh Times, November 18, 1976.

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী রচিত পুস্তক-পুস্তিকা

১। *মাও সেতুঙ্গ এর দেশে।* (প্রকাশনক- নুরজাহান সুলতান- পুঁথিপত্র প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৬৮।

২। *ভোটের আগে ভাত চাই* (প্রকাশকঃ আজাদ সুলতান, গণতান্ত্রিক কর্মী শিবির) ১৯৭০।

৩। *বাংলার কৃষক তোমরা প্রস্তুত হও,* (প্রকাশক, মনীন্দ্র মহাজন, চট্টগ্রাম) ১৯৭২।

৪। *আমার পরিকল্পনায় ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয়,* সন্তোষ, ১৯৭০।

৫। *রবুবিয়াতের ভূমিকা,* সন্তোষ, মে, ১৯৭৪।

৬। *তোমরা রব্বানী হইয়া যাও,*-সন্তোষ, ১৯৭১।

৭। *কেন ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয়,* সন্তোষ, ১৯৭১।

৮। *ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয়ের রূপ ও কাঠামো,* সন্তোষ, ১৯৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

৯। *মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সম্পাদিত প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাঃইত্তেফাক।* সাপ্তাহিক, ১৯৪৯ সম্পাদকঃ মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। তার পর প্রকাশক সম্পাদক ও মুদ্রক ইয়ার মোহাম্মদ খান। কিছুদিন মোজাফ্ফর আহমদ-সম্পাদনা করেন। ১৯৫১ সালে ১৪ আগস্ট থেকে সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহন করেন তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া।

১০। *গণমুক্তি, সাপ্তাহিক* প্রতিষ্ঠাঃ মওলানা ভাসানী। কালুর ঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর, ভারত থেকে প্রকাশিত। ১ নভেম্বর ১৯৭১।

১১। *হককথা,* প্রচার বুলেটিন, মহিপুর, বগুড়া থেকে প্রকাশিত, ১৯৬৭-৬৮।

১২। *সাপ্তাহিক হককথা।* ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ থেকে ২২ সেপ্টম্বর ১৯৭২। তারপর এর প্রকাশনা সরকার বন্ধ করে দেয়। সম্পাদকঃ সৈয়দ ইরফানুল বারী প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষকঃ মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। ১৯৭৬ সনের ১২ জানুয়ারী থেকে পূনঃপ্রকাশিত হয় সন্তোষ থেকে।

১৩। *বিশ্বশান্তি।* সম্পাদক-মওলানা ভাসানী টাঙ্গাইল, প্রকাশকাল ১৯৭৫।

এছাড়া দীর্ঘ জীবনে তিনি প্রকাশ করেছিলেন সংখ্যাহীন বুলেটিন ও প্রচার পত্র যার প্রায় সবই আজ দুস্প্রাপ্য, সেগুলোর কয়েকটিঃ

বাংলা খুৎবা, ১৯৭৯।
সত্যকথা, ১৯৭৯।
ভাসানীর জেহাদ, ১৯৭৩।
ভাসানীর সত্যকথা, ১৯৭৩।
সত্যের জয়, ১৯৭৩।
ভাসানীর কথা, ১৯৭৪।